শিক্ষা-নীতি

বিশ্বভারতীর শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
বর্তমানে ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ সংশ্লিষ্ট, বুরো
অব্ এডুকেশনেল এণ্ড সাইকলজিকেল রিসার্চের
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ. (লণ্ডন)

ও

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণকেন্দ্রের
শিক্ষা-বিষয়ক অধ্যাপক

শ্রীগৌরী সেনগুপ্তা, বি. এ. (বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত)
'সার্টিফিকেট ইন্ একটিভিটি এডুকেশন' (বিশ্বভারতী)

প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
১৯৫৬

প্রকাশক :—
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মূল্য ঃ চারি টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :—
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষাদানকার্যও দিন দিনই অধিকতর বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, শিক্ষাদান সম্বন্ধে পূর্বের অনেক ধারণারই আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা নূতন সত্য জানিতে পারিয়াছি এবং আরও জানিতে পারিব বলিয়া ভরসা করিতেছি।

অপরদিকে সভ্যতার অগ্রগতি এবং সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার প্রয়োজন যেমন বাড়িয়াছে, শিক্ষাদান কার্যও তেমন দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধের মত গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর না হইয়া, অধুনাতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে কার্যকারণের বিচার দ্বারা, সুনির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর না হইতে পারিলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পিছাইয়া থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই। শিক্ষাদানকার্যে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (শিক্ষাব্রতী এবং পিতামাতা) শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধে অধুনাতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

অধুনাতম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, সরলভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষার মূলনীতিগুলির আলোচনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার চেষ্টা এই পুস্তকের অন্যতম বিশেষত্ব। দীর্ঘদিন [illegible] শিক্ষণ শিক্ষাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় ঐরূপ একখানা পুস্তকের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। বর্তমান পুস্তকের দ্বারা ঐ অভাব কতখানি দূর হইল তাহা শিক্ষাব্রতীরাই বিচার করিবেন।

শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় এই উভয়ের শিক্ষার্থীদেরই এই পুস্তক বিশেষ কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মোটামুটিভাবে শিক্ষানীতি বিষয়ে তাহাদের পাঠ্যক্রমের সকল বিষয়ই ইহা[illegible] লোচি[illegible] হইয়াছে। অথচ কোন বিশেষ পুস্তকের অনুবাদ নহে বলিয়া, ইহাতে [illegible]ব এবং ভাষার জটিলতা নাই এবং ইহার দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক। অধুনাতম জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং আমাদের সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার

শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যদিও অভিজ্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃসৃত হইয়া বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহা আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাধনে সমর্থ হয় না। আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই শিক্ষা

সূচীপত্র

মুদ্রাকর :—
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও তাহার মাধ্যম

"That knowledge which purifies the mind and heart is alone true knowledge, all else is only negation of knowledge."

—*Sri Ramkrishna.*

শিক্ষা মানুষের ব্যাপকতম কর্মের মধ্যে একটি। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের সম্ভাবনার সংগেই স্বরু হয় মানবের শিক্ষা এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে।
প্রায় প্রত্তি মুহূর্তে আমরা কিছু নূতন শিখি কিংবা পুরাতন
অভিজ্ঞতার ফলে ব অভিজ্ঞতার নূতন রূপে রূপদান করি। জন্মের
উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া ওঠে। ছোট্ট শিশুকে আমরা প্রত্যক্ষ
যাপন করিতে সাহায্য করে, তাহাই ক্রমে একট একট করিয়া কথা

শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাকেই আমরা শিক্ষা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে অতি সহজেই অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকি। কিন্তু মনীষী বার্নড শ' বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছে। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভ করেন নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় বটে, তবে এই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়। এমন কি মানুষ আজীবন যে শিক্ষালাভ করে তাহাতে বিদ্যালয়ের অবদান সামান্যমাত্র। আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যদিও অভিজ্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃসৃত হইয়া বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহা আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাধনে সমর্থ হয় না। আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই শিক্ষা

বিদ্যালয়ের শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়

সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন, পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ব্যাঙাচির স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাভাবিক ক্রিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘদিনের জন্য দমন করিয়া রাখিয়া অবশেষে তাহাকে জলে ছাড়িয়া দিলেও সে জন্মগত ক্ষমতা গুণে সাঁতার কাটিতে পারে। আবার সুস্থ সবল মনুষ্য সন্তানকে জন্ম হইতে দীর্ঘকালের মত শয্যাশায়ী করিয়া রাখা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, নিজ ক্ষমতা-গুণেই সে হাঁটিতে শিখিয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহারের পরিবর্তন

(খ) কিন্তু মানুষের অধিকাংশ পরিবর্তনই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতার ফলে শিক্ষাতেও পার্থক্য দেখা যায়। কেউ বাংলা বলিতে শেখে, কেউ বা ইংরেজীতে অভ্যস্ত হয়, কেউ গণিতে আগ্রহশীল, কেউ বা দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করে; কাহারও সদভ্যাস গঠিত হয়, কেউ হয়তো আবার ক... অভ্যস্ত হয়।

অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের পরিবতন

মুদ্রাকর :—
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মানুষের এই শিক্ষাকে নানাভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, (ক) আমরা নানারূপ **কৌশল শিক্ষা** করি, যেমন—পড়া, লেখা, রন্ধন ইত্যাদি; অর্থাৎ জীবনধারণ ও জীবিকার অর্জনের জন্য বিবিধ কৌশল শিক্ষা। (খ) **জ্ঞান লাভ**,—যেমন—ভূগোলের জ্ঞান, ইতিহাসের জ্ঞান ইত্যাদি। (গ) **অভ্যাস শিক্ষা**—পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকা, যথাস্থানে জিনিস রাখা ইত্যাদি। (ঘ) **নানারূপ অনুভূতি-সৃষ্টি ও তাহার প্রকাশ**—যথা—ঘৃণা, ভয়, পছন্দ, বা অপছন্দের বোধ ইত্যাদি। (ঙ) **চারিত্রিক শিক্ষা**—সত্যাচার, ন্যায়নিষ্ঠা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন ভাল দিকে না হইয়া মন্দ দিকেও হইতে পারে। কিন্তু কু বা অসৎ শিক্ষাকে আমরা শিক্ষারূপে গণ্য করিতে পারি না। সুতরাং উপরিলিখিত আলোচনা হইতে আমরা নিম্নরূপ শিক্ষার সংজ্ঞাতে উপস্থিত হইতে পারি:

শিক্ষার সংজ্ঞা

অভিজ্ঞতার ফলে ব্যক্তির ব্যবহারের যে পরিবর্তন তাহাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া সমাজে সার্থক এবং সফল জীবন যাপন করিতে সাহায্য করে, তাহাই শিক্ষা।

শিক্ষার অর্থ সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাকেই আমরা শিক্ষা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যে কখনও বিদ্যালয়ে যায় নাই তাহাকে অতি সহজেই অশিক্ষিতের পর্যায়ে ফেলিয়া থাকি। কিন্তু মনীষী বার্নড শ' বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে গিয়া তাঁহার শিক্ষা ব্যাহত হইয়াছে। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বিদ্যালয়ের শিক্ষা-লাভ করেন নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয় বটে, তবে এই শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়। এমন কি মানুষ আজীবন যে শিক্ষালাভ করে তাহাতে বিদ্যালয়ের অবদান সামান্যমাত্র। আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় সাধারণতঃ জ্ঞানমূলক শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে। ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। এই জ্ঞান যদিও অভিজ্ঞতা, কিন্তু ইহা অপরের মুখনিঃসৃত হইয়া বা পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের নিকটে আসে। অনেক সময়ে ইহা আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমাদের ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট পরিবর্তন-সাধনে সমর্থ হয় না। আবার আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, শুধু জ্ঞানলাভের মধ্যেই শিক্ষা

বিদ্যালয়ের শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নয়

সীমাবদ্ধ নয়, ইহার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক। অভ্যাস-গঠন, চরিত্র-গঠ অনুরাগ-সৃষ্টি প্রভৃতি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের ভিতরে আসে ন কাজেই শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে শিক্ষা নাম দেওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে আমরা শিক্ষালাভ করি। (ক) শিক্ষালাভে প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষালাভ, যথা- বিদ্যালয়ের শিক্ষা। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই বিদ্যাল সৃষ্টি। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সম্প সচেতন। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিভাবে শিক্ষা পরিচালিত হইবে তা নির্দিষ্ট থাকে। যুগ যুগ ধরিয়া সমাজ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে তা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ও মাধ্যমের ভিতর দিয়া ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে বিত করার চেষ্টা চলে। এইজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ এইরূপ শিক্ষাকে Formal Education বা প্রত্যক্ষ শিক্ষা বলা যায়। বিদ্যাল ছাত্র এবং শিক্ষক উদ্দেশ্য বিশেষ লইয়া সম্মিলিত হয়। শিক্ষকের উদ্দে থাকে ছাত্রকে বিদ্যার্জনে সাহায্য করা এবং ইহা দ্বারা নিজের জীবিকার সংস্থ করা। অপর দিকে ছাত্রের উদ্দেশ্য শিক্ষকের সাহচর্যে ও পরামর্শে শিক্ষাল করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু পূর্বনির্ধারিত থাকে। শিক্ষালাভ-পদ্ধ মোটামুটি স্থিরীকৃত থাকে। ছাত্র, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট নিয়ম লিপিবদ্ধ থাকে। উদ্দেশ সিদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যালয়ে পারিপার্শ্বিক বিশেষের সৃষ্টি হয়। যেমন—শিক্ষ শিক্ষণ, বিদ্যালয়। এখানে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ শিক্ষাদানকে বৃত্তি হিসা গ্রহণ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে সাহায্য করিতে আসেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত ইহাতে যোগ দেয়। এই উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে শিক্ষ ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বিদ্যমান। এই উদ্দে সিদ্ধির জন্য কি কি বিষয় পাঠ করিতে হইবে, কি কি কাজ করিতে হই কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহাও মোটামুটি স্থির থাকে এই ভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পারিপার্শ্বিকের সা নির্দিষ্ট পথে সংযোগের দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য অগ্রসর হয়।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শিক্ষাই নিজের অজ্ঞাতে হয় এবং এম অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠানের (Institution) ভিতর দিয়া তাহা ঘটে যাহাদে মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাপ্রদান নয়; যেমন—পরিবার, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি

প্রত্যক্ষ শিক্ষা

পরিবারের নিকট হইতে আমাদের অনেক অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটে ; সমাজে সাধারণ জীবন-যাপনের দ্বারা আমরা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাই আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানের অনুশীলনে ও চরিত্রগুণের বিকাশসাধনে সহায়তা করে। এই শিক্ষাকে Informal Education বা পরোক্ষ শিক্ষা বলা চলে।

পরোক্ষ শিক্ষা

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা

প্রতিনিয়তই মানুষ শিক্ষালাভ করিতেছে ও অপরকে শিক্ষালাভে সাহায্য করিতেছে। অথচ এই শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। মানবজীবনের মত তাহার কৃষ্টি, কলা ও সভ্যতাও গতিশীল। এই গতিশীলতাই বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শে, চিন্তাধারায় ও প্রয়োজনে পরিবর্তন সাধিত করে। এইজন্য বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ তৎকালীন সাময়িক আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়া থাকেন। কাজেই উহা পূর্ণত্বের দাবী করিতে পারে না। পরবর্তী যুগে হয়তো আবার নির্ধারিত সংজ্ঞাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আদর্শের সংগে সামঞ্জস্য-বিধানের উদ্দেশ্যে হয় পরিমার্জিত, নয় সংশোধিত অথবা পরিবর্তিত কিম্বা পরিবর্ধিত করিতে হয়। কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞার আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

অনেকে জ্ঞানার্জন ক্রিয়াকে শিক্ষার সংজ্ঞারূপে নির্দেশ করেন। কোন বিষয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করিলে ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান করা হয়। কিন্তু কিছু জানা বা নিছক জ্ঞান অর্জন করা ও শিক্ষালাভ করা এক কথা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জ্ঞান আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তনসাধনে সাহায্য না করে ততক্ষণ শিক্ষালাভ হইয়াছে বলা যায় না। 'সদা সত্য কথা বলা উচিত'—এই জ্ঞান আমরা শিক্ষকের উপদেশ কিংবা পুস্তকের মাধ্যমে পাইতে পারি, কিন্তু ঐ জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সত্যবাদী করিয়া না তুলিতে পারে ততক্ষণ উহাকে শিক্ষা বলা চলে না। কলিকাতা হইতে দিল্লী কত দূরে সেই ভৌগোলিক জ্ঞান আমাদের আছে ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দিল্লী যাইতে হইলে কোথা হইতে কিভাবে যাইব ভাবিয়া যদি বিচলিত ও ভীত হইয়া পড়ি তবে আমাদের জ্ঞান শিক্ষায় পরিণত

জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নহে

হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। কানে শোনা বা চোখ দিয়া পড়া অর্থই জ্ঞানলাভ নয়। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষালাভের পন্থাকে অতি সহজ বলিয়া অনুমান করে। শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা করেন, আর শ্রবণের দ্বারা ছাত্র জ্ঞানার্জনক্রিয়া সম্পন্ন করে। শিক্ষক যেন একটি পরিপূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ড; তিনি ছাত্রের দুই কর্ণে দুইটি নল সংযোজন করিয়া তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কিছু জ্ঞান ছাত্রের কানের ভিতর দিয়া মনে প্রবেশ করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বস্তুতঃপক্ষে ছাত্রের আপন অভিজ্ঞতা ভিন্ন কোন জ্ঞানলাভ হয় না। শিক্ষকের বক্তৃতা বা পুস্তকপাঠ ছাত্রের শত শত অভিজ্ঞতার মধ্যে দুইটিমাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত পুস্তকের বিষয় বা শিক্ষকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছাত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত সংযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আমরা শিক্ষা বলিতে পারি না।

Dewey দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, (ক) নিষ্ক্রিয় জ্ঞান ও (খ) সক্রিয় জ্ঞান। নিষ্ক্রিয় জ্ঞান শুধু মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত তাহার কোন সংযোগ নাই; ফলে উহা আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় না এবং আমাদের পণ্ডিত-মূর্খে পরিণত করে। সক্রিয় জ্ঞানই প্রকৃত শিক্ষা। ইহা পুস্তক বা শিক্ষকের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত হইলেও উহার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংযোগ থাকে বলিয়া আমাদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন নির্দিষ্ট কোন কৌশল আয়ত্ত করা কিংবা কোন অভ্যাস-গঠনই শিক্ষা। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নির্দিষ্ট কৌশল শিক্ষা বা অভ্যাসগঠনই শিক্ষা নয়

ব্রহ্মচারীর আহার-বিহার বা জীবনযাপন সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম-বিশেষের ব্যবস্থা ছিল। আশা করা হইত, এই সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবনের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া তুলিবে। প্রাচীন ভারতে ও ইউরোপের মধ্যযুগে শিক্ষার ইহাই ছিল সংজ্ঞা। বারবার আবৃত্তি, পাঠ এবং অভ্যাস, জ্ঞানদান ও চরিত্রগঠনের পদ্ধতি ছিল। কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে এই ধারণা ভুল। বারবার অনুশীলনের ফলে অভ্যাস গড়িয়া ওঠে এবং অনেক সময়ে অভ্যাস মানুষের ব্যবহারের জন্য দায়ী হয়, একথা সত্য, তথাপি শুধুমাত্র অভ্যাসগঠনই শিক্ষা নয়, শিক্ষার সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। জ্ঞানার্জন, চিন্তা ও কল্পনার বিকাশ, চরিত্র-গুণের প্রকাশ

ইত্যাদিতে অভ্যাসের অবদান খুব বেশী নয়; মানুষের অভিজ্ঞতাকেও নির্দিষ্ট সীমার রেখায় আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়; যদিও বা তাহা সম্ভব হয় তাহার ফলে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশলাভের আশা করা যায় না। প্রত্যেকটি মানুষকে ছাঁচে ফেলিয়া গঠন করা সম্ভব নয়। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে কলের পুতুল তৈয়ারী হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হয় না।

অনেক সময়ে শিশুর উপর বয়স্কদের প্রভাব বিস্তারকে শিক্ষার প্রধান উপায় মনে করা হয়। শিশু যেন একতাল নরম মাটি, যে ছাঁচেই তাহাকে ঢালা যাইবে সেই অনুকৃতিতেই সে গড়িয়া উঠিবে এবং বয়স্কগণকে যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানের প্রতিভূ মনে করিয়া সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক এই শিশুকুলকে অনুরূপভাবে গঠন করার ব্যবস্থা চলে। কিন্তু প্রথমেই এই মতবাদের গলদ ধরা পড়ে। শিশুকে নরম মাটির সহিত তুলনা করা ভুল, কারণ নরম মাটির ন্যায় আকৃতিহীন হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করে না। জন্মমাত্রই তাহারা সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার পথে চালিত হয়; ইহার বিপক্ষে তাহাদের প্রভাবান্বিত করা কঠিন। তবে বয়স্কদের প্রভাব যে শিশুর উপর কাজ করে না এমন নয়। সাধারণতঃ শিশুরা অনুকরণপ্রিয় হইয়া থাকে। তবে শিশু তাহাকেই অনুকরণ করে যাহার সহিত তাহাদের ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের ব্যবহার পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির অনুকূল হয়। কিন্তু বয়স্ক ও শিশুর মধ্যে অনুরূপ প্রীতিপূর্ণ পারস্পরিক প্রয়োজন নিবৃত্তির সম্বন্ধ না থাকিলে অনেক সময়েই তাহাদিগকে বয়স্কদের বিপরীত চরিত্রের হইতে দেখা যায়। অন্যদিকে শিশুর উপর অধিক প্রভাব বিস্তারের ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের গতি ব্যাহত হইতে পারে এবং ইহা প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। বয়স্কদের প্রভাব ব্যতীত আরও বিভিন্নরূপ প্রভাব শিশুর মনে কাজ করিয়া তাহাদের ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে।

শিশুর উপর বয়স্কদের প্রভাব শিক্ষা নয়

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শুধু জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নয় বা ব্যবহারের অনুশীলনের ফলে কোন কৌশল বা নির্দিষ্ট অভ্যাসগঠনকেও প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে না, অথবা বয়স্কদের প্রভাব বিস্তারের দ্বারা শিশুর অভ্যাস ও চরিত্রগঠনও সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। শিক্ষালাভ-পদ্ধতি ও মানবজীবনের বিকাশের পদ্ধতি পৃথক নয়। জীবনধারণের ভিতর দিয়াই মানুষ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, জীবনধারণের সূত্রে মানব তাহার প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং পার্থিব

শিক্ষা মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সহিত জড়িত

পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই সম্বন্ধ পারস্পরিক। এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে থাকে মানুষের প্রয়োজন-নিবৃত্তির তাগিদ এবং ইহার ফলেই দেখা যায় পারস্পরিক পরিবর্তন। মানুষের স্বভাব, কৌশল-শিক্ষা, জ্ঞান ও ভাবশিক্ষা প্রভৃতি এরূপ পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সংগঠিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধের মধ্যে এক পক্ষকে শিক্ষক ও অপর পক্ষকে ছাত্র নাম দেওয়া যাইতে পারে। পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন শিক্ষাই লাভ করা যায় না। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের ব্যবহারই ঐরূপ সম্বন্ধের ফলে পরিবর্তিত হয়—যদিও ছাত্রের পরিবর্তনই অধিকতর হইয়া থাকে। শিক্ষাকে তাই Bipolar process বলা হইয়া থাকে।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারাই শিক্ষালাভ হয়

জীবনের গতিপথে আমরা একে অপরকে পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শিক্ষাদান করিয়া চলিয়াছি। আজ যে শিক্ষক, কাল হয়তো সে ছাত্র হইতে পারে; আবার এক বিষয়ে যে শিক্ষক অপর বিষয়ে সে ছাত্র হইতে পারে। পারিপার্শ্বিকের সহিতও আমাদের এই ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা এবং জীবনে কোন পার্থক্য নাই।

সুতরাং এইভাবে আমরা শিক্ষার একটি আধুনিকতম পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারি যে—

ছাত্র ও শিক্ষকের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ব্যবহারের যে পরিবর্তন, যাহা জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশে সহায়তা করে তাহাই শিক্ষা।

জীবনকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত দিকে শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা লইয়া একটি জীবন। শিক্ষা ইহাদের সুষম বিকাশ সাধন করিবে। সমষ্টিগত দিকে জীবন সমাজের সহিত যুক্ত। উপযুক্ত নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনযাপনের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাই মানবজীবনের এই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে।

শিক্ষার মাধ্যম

প্রত্যেক সমাজই নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া পারিপার্শ্বিকের সহিত আদান-প্রদান করিয়া থাকে। মানুষ তাহার প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্য কোন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে এবং তাহার মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে সামাজিক

প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। সামাজিক প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্য সমাজ কর্তৃক গৃহীত পারিপার্শ্বিকের সহিত আদান-প্রদানের নির্দিষ্ট পথ বা উপায়ই এক একটি প্রতিষ্ঠান। যেমন, দেবমন্দির একটি প্রতিষ্ঠান। ইহার সামাজিক প্রয়োজন মানুষের ধর্মপিপাসা নিবৃত্তি করা ও বিশ্বশক্তির নিকট আত্মসমর্পণের দ্বারা নিজের মনে শান্তি ও স্বস্তির ভাব আনয়ন করা। সমাজের অধিকাংশ লোকই দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দেবালয়ের মাধ্যমে দেবতার নিকট পূজা ও ভক্তি নিবেদন করিয়া আসিতেছে এবং ইহা অনেকটা তাহাদের সহজাত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বিবাহ, পরিবার, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

এই সমাজসৃষ্টির গোড়া হইতেই শিক্ষার অভিযান সুরু। শিক্ষার স্থান নাই অথচ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এমন কখনই হইতে পারে না। সমাজের সভ্যদের মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ঐক্যই সমাজের ভিত্তি। আমরা একই ভাষার সাহায্যে মনের ভাব আদান-প্রদান করি, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজন নিবৃত্তির ক্ষেত্রে পরস্পরে যথেষ্ট মিল আছে এবং এই মিলই যে কোন সমাজের আদি কথা। এইরূপ সামাজিক ঐক্যের ভিত্তিও শিক্ষা। সমাজের আদিতে একত্র বাস করিয়া বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া লোকে একরূপ শিক্ষালাভ করে; কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়, কি পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে হয়, জ্যেষ্ঠস্থানীয়কে কিভাবে সম্মান দিতে হয়, হলকর্ষণ কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি শিক্ষা মানুষ পরস্পরকে দেখিয়া ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া শিখিয়া লয়। এইরূপ শিক্ষাকেই পূর্বে পরোক্ষ বা Informal শিক্ষা বলা হইয়াছে; এবং সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হইতেই সমাজে এইরূপ পরোক্ষ শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে।

সমাজ গঠনে শিক্ষার অবদান

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগে সংগেই প্রত্যক্ষ শিক্ষার আরম্ভ। সমাজে জ্ঞানের ভাণ্ডারের বিশালতার সংগে জটিলতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়েই প্রত্যক্ষ শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশেষ করিয়া যখন লিখিত ভাষার সৃষ্টি হইল এবং গণিতের জ্ঞানের কিছু উন্নতি ঘটিল, তখন লেখাপড়া এবং গণিতের কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য প্রত্যক্ষ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন দেখা গেল। ফলে এই সমস্ত জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান

ব্যক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ছিল গুরু-শিষ্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিতেরা শিক্ষাদানকে ধর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণ তাঁহাদের নিকট আসিত। দেশের রাজা হয়তো এই উপাধ্যায় বা পণ্ডিতদের ভূমিদান করিয়া তাঁহাদের পরিবার ও ছাত্রগণের ভরণপোষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ছাত্রগণ উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যরসের দ্বারাই আকৃষ্ট হইত। এইরূপ ক্ষেত্রে একজন উপাধ্যায়ের অবর্তমানে তাঁহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে চলিবে তাহার কোনরূপ স্থিরতা থাকে না। উপযুক্ত শিষ্য থাকিলে হয়তো তিনি এই প্রতিষ্ঠান চালাইতে পারেন কিংবা অন্য কোথাও আবার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারেন।

প্রাচীন এথেন্সেও শিক্ষার ব্যবস্থা অনেকাংশে এইরূপ ছিল। সক্রেটিস্, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ এইরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানে আমরা বিদ্যালয় বলিতে যাহা বুঝি রোমান সভ্যতার যুগে বিশেষভাবে তাহার সৃষ্টি হয়। রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বহু বিস্তৃত হওয়ার ফলে সমস্ত রোম-সাম্রাজ্যের নাগরিকদের একই সভ্যতার অংশভাগী করিবার উদ্দেশ্যে রোম এবং রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিক্ষক পরিবর্তিত হইলেও বিদ্যালয় একস্থানে একইভাবে চলিতে থাকিত। ইউরোপের মধ্যযুগে বিদ্যালয় সাধারণতঃ চার্চের সংলগ্ন ছিল। আমাদের দেশেও মন্দির সংলগ্ন চতুষ্পাঠী বিরল নয়। সামাজিক জ্ঞানের অগ্রগতির সহিত উচ্চশিক্ষাদানের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাই। যেমন, তক্ষশীলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠানরূপে বিদ্যালয়

লেখাপড়া এবং গণিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইলেও ক্রমে তাহার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হইতে লাগিল। লেখা এবং পড়া কৌশলমাত্র। উহাদের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাদানই বিদ্যালয়ের ব্রত হইল—বিদ্যালয় ধর্ম এবং কৃষ্টির ধারক ও বাহকরূপে পরিণত হইল। চারিত্রিক শিক্ষাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হইল। প্রাচীন

ভারতে শাস্ত্রগ্রন্থই ছিল ধর্ম ও কৃষ্টির আধার, তাই তাহাই ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু, এবং আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত চরিত্রগঠন করিয়া দেওয়াই ছিল বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইউরোপের মধ্যযুগে প্রায় একই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিষয়বস্তুও প্রায় একইরূপের ছিল। ইউরোপে নবযুগের (Renaissance) সূচনার পরে কৃষ্টি অনেকখানি ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া পড়ে এবং প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের কৃষ্টিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করা হয়। ফলে শিক্ষার সহিত ধর্মের সম্বন্ধ কমিয়া যায় এবং প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে সাহিত্য ও দর্শনের পাঠের উপরই বিদ্যালয়ে অধিক জোর দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্রমবিকাশ

এই সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বৃত্তি-শিক্ষাদানের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের তেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল না। বিদ্যালয়ের জীবন এবং বিদ্যালয়ের আদর্শ সমাজজীবন হইতে বহু উপরে রাখার চেষ্টা করা হইত। বৃত্তির জন্য কোন বিশিষ্ট শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল না। প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ পুত্র পিতার বৃত্তিই গ্রহণ করিত এবং তাঁহার সাহচর্যে বৃত্তি শিক্ষা করিত। ইউরোপে মধ্যযুগে শিক্ষানবিশীই বৃত্তিশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আবার সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষার আওতার মধ্যেও আসিতেন না। প্রাচীন ভারতেও শূদ্রদের বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের প্রথা ছিল না। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে দাসদের শিক্ষা-ব্যবস্থার বাহিরে রাখা হইত। ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মযাজকগণ এবং জমিদারগণই সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসিতেন। নবযুগের পরেও নূতন ধনী বণিক সম্প্রদায় ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষার্থী। ফলে বিদ্যালয়ের জ্ঞানলাভ করিতে জনসাধারণ সুযোগ পাইত না এবং জনসাধারণের জীবনের সহিত শিক্ষার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জড় বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, শিল্পবিপ্লব এবং গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে বিদ্যালয়েরও পরিবর্তন হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হইল। গণতন্ত্রকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে সকল নাগরিককেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে, এমনকি বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। শিক্ষা সম্প্রসারণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হইল। অপরদিকে বৃত্তির জটিলতা এত বৃদ্ধি পাইল যে, বিদ্যালয়কে বৃত্তি-শিক্ষাদানে

অগ্রসর হইতে হইল। বর্তমান জগতে বিজ্ঞানের প্রাধান্যের জন্য বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের স্থান বিশেষভাবে স্বীকৃত হইল। ফলে বিদ্যালয়ের প্রকৃতি এবং পাঠ্যবস্তুর আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। ধর্ম এবং কৃষ্টিকে অনেকখানি পরিবারের এবং সমাজের হাতে ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যালয় ছাত্রদিগকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব বিদ্যালয়ের উপরেও পড়িল। অধিক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে সকলেই অবহিত হইয়া উঠিলেন। আদর্শবাদ, কৃষ্টি এবং উপযুক্ত. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত বস্তুতান্ত্রিকতা যে মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে বাধ্য—ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় সকলে ভীত হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে পরিবারে এবং সমাজে চারিত্রিক এবং কৃষ্টিসংক্রান্ত শিক্ষার সুযোগ দিন দিনই সংকুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে আদর্শবাদ, কৃষ্টি এবং চরিত্র শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণেও বিদ্যালয়কে অগ্রসর হইতে হইল। বর্তমানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত করা যায়।

১। আত্মাভিব্যক্তি এবং সামাজিক দায়িত্ব-পালনের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান কৌশল আয়ত্তকরণ। যেমন—পড়া, লেখা, গণিত ইত্যাদি।

২। সমাজজীবনে সুখী ও সার্থক হইবার প্রয়োজনে নিম্নতম জ্ঞান অর্জন। যেমন—ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান।

৩। আত্মোন্নতি ও উপযুক্ত নাগরিকরূপে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বিকাশ। যেমন—স্বাধীন চিন্তা, অধ্যবসায়, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি।

৪। আদর্শবোধ এবং কৃষ্টি-সংক্রান্ত শিক্ষা।

৫। বৃত্তি-শিক্ষাদান বা ভবিষ্যৎ বৃত্তির জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তুতকরণ।

প্রচলিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কার্য সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা হইতে দেখা যায়। প্রথমতঃ, শিক্ষকের বক্তৃতা। শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীকে পরিবেশন করিয়া যান। শিক্ষকের নিকট শুনিয়া ছাত্র তাহা আয়ত্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকের সাহায্যেও জ্ঞান বিতরণ করা হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের দ্বারা ছাত্রগণ জ্ঞানার্জন করে। প্রাচীনকালে যখন পুস্তক সহজলভ্য ছিল না, তখন শিক্ষক কোন বিষয় আবৃত্তি করিতেন এবং ছাত্রগণ তাহা বারবার আবৃত্তির দ্বারা শিক্ষা করিতেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট

বিদ্যালয়ে গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি

ক্ষেত্রে শিক্ষক আবৃত্তির সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করিতেন। বর্তমানেও মোটামুটি সেই ব্যবস্থাই আছে। শিক্ষক বক্তৃতা দেন এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করেন। শিক্ষকের কথা এবং পুস্তকের কথা ছাত্রেরা বারংবার অভ্যাসের দ্বারা মুখস্থ করিয়া লয়। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রাচীনকালে তবুও ভাল ছিল। বর্তমানে এই ব্যবস্থায় শিক্ষা আরও কম হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে জ্ঞান অন্ততঃ শিক্ষক এবং পুস্তক-প্রণেতার অনুভূতিগম্য ছিল এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ শ্রদ্ধাপূত ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক পুস্তক হইতে মুখস্থ করিয়া ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করেন এবং পুস্তক-প্রণেতাগণ বিভিন্ন পুস্তক হইতে কতকগুলি তথ্য একত্রিত করেন মাত্র। অধিকন্তু ছাত্রগণও শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে না; সুতরাং এই বক্তৃতা শুনিয়া বা তথ্য পাঠ করিয়া ছাত্রদের জ্ঞানের কোন উপলব্ধিই হয় না। কিছু পরিমাণে তথ্যমূলক জ্ঞানার্জন হইলেও ছাত্রের ব্যক্তিত্ব গঠন বা ব্যবহারের পরিবর্তন এই শিক্ষাতে হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কানে শোনা বা চক্ষু দিয়া পড়াই শিক্ষা নয়। স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই মানুষ শিক্ষা অর্জন করে।

বিদ্যালয় জীবনে আপন আপন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে বর্তমানে এমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যেখানে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী-বিদ্যালয় জীবনে আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেমন হওয়া উচিত, ইহার উত্তরে শিক্ষাবিদ্ ষ্টিফেনসন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন —'আদর্শ বিদ্যালয় হইবে একটি গবেষণাগার, নির্জীব শ্রোতাদের প্রেক্ষাগার নয়।' বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ সেই একই কথা বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলিয়াছেন: "The School will select and represent the best of the society."—বিদ্যালয়কে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, শিক্ষার্থিগণ যেন ইহাকে একটি ছোটখাট সুন্দর সমাজ-রূপে ভাবিতে পারে এবং ইহার ভিতর স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে পাইয়া, এই সমাজে ছাত্র এবং শিক্ষকের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে।

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমষ্টিমাত্রই সমাজ নয়; তাহা অনেক সময় জনতারই নামান্তর। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিগণ যখন প্রথম আসে তাহাদের

মধ্যে সেই সময়ে কোন সমাজ-বন্ধন গড়িয়া ওঠে না। তাহারা বিভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ হইতে বিভিন্ন অভ্যাস ও ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা প্রভৃতি লইয়া আসে। তাহাদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য বলিতে তখন কিছুই থাকে না। শিক্ষকের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সভ্য হইয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ-স্থাপন সহজ হইয়া যায়। ক্রমশঃ তাহারা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে নিজের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করে ও বিদ্যালয়রূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তাহাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং ইহার মাধ্যমেই শিক্ষা অগ্রসর হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়-সমাজ একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ। ইহার প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, যথা—শ্রেণী, পাঠাগার, সংঘ প্রভৃতি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এই সমাজের মধ্যে কাজ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া শিক্ষার্থী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তাহা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়কে সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আর স্বতন্ত্রভাবে চিন্তিত হইতে হয় না। যে বিদ্যালয়ে সামাজিক অনুভূতি যত কম তাহাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ততই ব্যাহত হয় ও শিক্ষাকার্যও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। আমাদের প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে এই পারস্পরিক আদান-প্রদান ও প্রীতি-বন্ধনের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাধ্য-বাধকতার মধ্য দিয়া বিদ্যালয়-সমাজ কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না।

কিভাবে বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিবে

তাহা হইলে দেখা যায় আধুনিক যুগে বিদ্যালয় একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ-বিশেষ। প্রত্যেক ছাত্রেরই এই সমাজের প্রতি যথাযথ কর্তব্য আছে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েই ইহার সভ্য এবং ইহার উন্নতি ও অবনতির জন্য দায়ী। ইহার সুযশ বা অপযশ তাহাদের উপরই নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের সভ্যগণ, ছাত্র এবং শিক্ষক যাহাতে দৃঢ় সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহার চেষ্টা প্রথম হইতেই করা প্রয়োজন।

একাত্মানুভূতি সমাজ-জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বিদ্যালয়ের পোষাক (School uniform) এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গীত উহা জাগরিত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ

পরিচয় নাও থাকিতে পারে, কিন্তু পোষাক দেখিলেই আপন সমাজের লোককে চিনিয়া লওয়া যায় এবং তাহার প্রতি এক বিশিষ্টরূপ আত্মীয়তা-বোধ জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের বাহিরে বা কোন অনুষ্ঠান-বিশেষে যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র একত্র হয় তখন এই অনুভূতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাই প্রতি বিদ্যালয়েই বিদ্যালয়-পোষাক প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহা আমাদের অভিভাবকদের আর্থিক সঙ্গতি, দেশের আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি ও রুচিবোধের সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং সামাজিক রীতি-অনুশাসন প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পোষাক ব্যতীত বিদ্যালয়সঙ্গীতও বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্য এবং ভালবাসা জাগাইয়া দিয়া ইহার সভ্যদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগরিত করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজ সঙ্গীত থাকা ভাল। ইহা বিদ্যালয়ের পূর্ব গৌরব, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সভ্যদের জীবনে বিদ্যালয়ের স্থান প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা—ছাত্রদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি ভালবাসা, উহার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি আনুগত্য জাগরিত করিয়া উহার সভ্যদের এক বিশিষ্ট একতার বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্রদের ছবি এবং পরিচয়, এবং মধ্যে মধ্যে নানাভাবে বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের সংগে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এই উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য বিভিন্ন কার্যের ছবি তুলিয়া তাহা ছায়াছবি বা Projector-এর সাহায্যে প্রদর্শন করা হইলে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং কার্যপদ্ধতি সহজে গ্রহণ করিতে পারে।

পরস্পরের সহিত মিলিয়া কার্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ-বন্ধন এবং একতাবোধ ঘনিষ্ঠ হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে এবং বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ কার্যের প্রচুর সুযোগ থাকা আবশ্যক। পাঠ্যবিষয় এবং Co-curricular উভয় কার্যেই এই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয়।

বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইলে একাত্মবোধ সহজতর হয়। বিদ্যালয়-সমাজ কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ নয়—গণতান্ত্রিক সমাজও বটে। এই বোধ ছাত্রদের মধ্যে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্রের নাগরিকের মত তাহারাও বিদ্যালয়ের সক্রিয় সভ্য এবং বিদ্যালয় তাহাদের প্রয়োজন-নিবৃত্তি এবং মঙ্গলের জন্য পরিচালিত হইতেছে এই বিশ্বাস আনিতে

হইবে। বিদ্যালয়-পরিচালনা সর্বদা শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় হওয়াই ভাল। তাহাদের কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বে আমাদের আস্থা রাখা প্রয়োজন। আমরা শিক্ষকগণই যে ছাত্রদের ভালমন্দের শ্রেষ্ঠ বিচারক তাহা সব সময় হয়তো ঠিক নয়। যে সমাজ নিজের সভ্যদের উপর নির্ভর করিতে পারে না তাহার নিজের মধ্যেই গলদ আছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যালয় সমাজের সভ্যদের হস্তে বিভিন্ন কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইবে। এই দায়িত্ব তাহারা পাইবে নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রথায় ভোটের সাহায্যে হওয়া আবশ্যক এবং নির্বাচিতের নাম দেওয়া যাইতে পারে নায়ক বা মন্ত্রী—যেমন, শ্রেণীনায়ক, প্রধান নায়ক, সংস্কৃতি-নায়ক, সাফাই-নায়ক ইত্যাদি। এই নায়ক বা মন্ত্রীরা যাহাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া না উঠিতে পারে তাহার জন্যও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থা থাকা উচিত। বিদ্যালয়-সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব ছাত্রদের মধ্যে যতবেশী বণ্টন করিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। নির্দিষ্ট সময়ে নায়ক পরিবর্তন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়, আজ যে আজ্ঞাকারী কাল সে আজ্ঞাবাহক—এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যেই গণতান্ত্রিক সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটিমাত্র গণতান্ত্রিক সংস্থা থাকিলে চলিবে না। বিদ্যালয়ে যেখানেই সমষ্টিগত কাজ (Group life) সেখানেই তাহা গণতান্ত্রিক পন্থায় নিয়ন্ত্রিত হইবে। যেমন বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে শ্রেণীতেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থা থাকিবে। এইভাবে বিদ্যালয় পরিচালনায় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বাধিকার ও অপরের প্রতি কর্তব্য-সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিবে। দায়িত্বপালনের সুযোগে তাহারা পরস্পরের প্রতি সহযোগিতাসম্পন্ন ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে। অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করা, নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা, নায়ক বা মন্ত্রীকে মান্য করা—এই বিবিধ চারিত্রিক গুণের বিকাশ এইভাবেই হওয়া সম্ভব এবং ইহাই যথার্থ শিক্ষা। বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের এই ক্ষুদ্ররূপটির মধ্যেই তাহাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক জীবনের সূত্রপাত হইবে।

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি ও জীবনযাত্রার প্রণালীও ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক প্রয়োজন ও সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত করা কর্তব্য। দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাঠ্যক্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা সমস্তই পারস্পরিক প্রয়োজন ও সম্মতির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সমাজের সভ্যদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা দ্বারাই ভাবের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শ্রেণীতে শিশুরা

মেলামেশার সুযোগ পায়, কিন্তু শ্রেণীর বাহিরেও বিভিন্ন শিশুদের মেলামেশার সুযোগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। এইজন্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে সভা, উৎসবানুষ্ঠান, অভিনয়, প্রদর্শনী, বনভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এইরূপ উৎসবানুষ্ঠানে স্থানীয় অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া বৃহত্তর সমাজের সহিত সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। ইহার অন্য একটি দিকও আছে ; অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা, মান্য করা ও আদর-আপ্যায়ন করাও ছাত্র-ছাত্রীরা শিখিয়া লইতে পারে।

এইভাবে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কর্মের স্থান রাখিয়া প্রত্যেকটি ছাত্রকে এই কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে ইহার সমাজ-জীবনের সহিত তাহারা একাত্ম হইয়া গড়িয়া ওঠে।

পরোক্ষ শিক্ষায় পরিবারের অবদান

শিক্ষাক্ষেত্রে যদিও প্রত্যক্ষ শিক্ষার (বিদ্যালয়ের শিক্ষা) অবদান অধিকতর স্বীকৃত, তবু প্রত্যক্ষ শিক্ষা অপেক্ষা পরোক্ষ শিক্ষাই আমরা অর্জন করি অধিক। আমরা জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষাগ্রহণ করি। সমাজ-জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে। পরিবার এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম।

প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান—পরিবার

পরিবারই আমাদের সর্বপ্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আমরা প্রত্যেকেই কোন একটি পরিবার-বিশেষে জন্মগ্রহণ করি এবং দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিবারই আমাদের জীবনের প্রধানতম সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং ইহার ভিতর দিয়াই আমরা জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলি নিবৃত্তি করি। পরিবারের রূপ বা গঠন-পদ্ধতি এক না হইলেও এমন কোন সমাজ কল্পনা করা যায় না যেখানে পরিবারের স্থান নাই। আমরা নিজেদের এক বিশেষ পরিবারভুক্ত জানিয়া মানসিক নিরাপত্তা অনুভব করি এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই ; পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া আমরা দায়িত্বপালনের শিক্ষাও গ্রহণ করি।

যদিও শিক্ষাদান পরিবারের উদ্দেশ্য নয়, তবু শিক্ষাদানের ক্ষমতা ইহার মত আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। কেন না পারিবারিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তন সহজেই হইয়া থাকে। একই পরিবারভুক্ত সদস্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া থাকে। পরস্পরের প্রয়োজন-

২

নিবৃত্তির ভিতর দিয়া পারিবারিক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। পরিবারের মধ্যে ভালবাসা এবং সদ্ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান থাকে। পরিবারের সভ্যগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একইভাবে এবং একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া একইরূপ কর্মে ব্রতী হয়। ফলে অতি সহজেই পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক আদর্শ ও রীতি-নীতি গ্রহণ করে, একের দ্বারা অপরে অতি সহজেই প্রভাবান্বিত হয়। তাই পরিবারকে এক হিসাবে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। আমাদের দেশের পরিবার সম্বন্ধে উপরিউক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এখনও আমাদের পারিবারিক জীবন পারস্পরিক স্নেহ, প্রীতি ও ত্যাগের ভিতর দিয়া গঠিত।

পারিবারিক শিক্ষার গুণ

একদিন শিক্ষার সকল দায়িত্বই পরিবারের ছিল। চরিত্রগঠন, সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা, ধর্মভাবে প্রণোদিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা—এমনকি বৃত্তি-শিক্ষাও পরিবারের দায়িত্বে ছিল। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারেরই এক একটি বিশিষ্ট ধারা ছিল। পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির উপদেশ ও উদাহরণে এবং পারস্পরিক মেলামেশায় পরিবারের সভ্যগণ সেই ধারা গ্রহণ করিত। পারিবারিক পূজা এবং অর্চনায় যোগদান করিয়া, কুলগুরু হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ধর্মাচরণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইত। আবার পারিবারিক কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে (যেমন—বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে) যোগ দিয়া সামাজিক আচার, নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করিত। অপরদিকে অনেক সময়ে পিতামাতার নিকটেই শিশুর হাতেখড়ি হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুত্র পিতার বৃত্তি গ্রহণ করিত এবং তাহার সাহচর্যে ঐ বৃত্তি-সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিত। বর্তমানে পরিবারের হাত হইতে শিক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি চলিয়া গিয়াছে। ইহার শিক্ষাদান ক্ষমতা আর ততখানি নাই। প্রত্যক্ষ শিক্ষার দায়িত্ব বিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। বৃত্তি-শিক্ষাদানের জন্যও বিভিন্নরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষার দায়িত্বও অনেকখানি বিভিন্ন সংঘ বা সার্বজনীন সামাজিক আনুষ্ঠানিকের উপরেই পড়িয়াছে। ধর্মশিক্ষার সুযোগও পরিবারে পূর্বের মত নাই। পরিবারের পরিধি পূর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ হইয়াছে এবং পরিবারের সভ্যদের সম্পর্ক আর পূর্বের মত ঘনিষ্ঠ নাই। এমনকি সর্বদা ঐ সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণও হয় না। তবু বর্তমান যুগে পরিবারের ভিতর দিয়া নিম্নলিখিতরূপে শিক্ষা হইয়া থাকে।

পারিবারিক শিক্ষা

(১) পিতামাতার, ভাইবোনদের মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া শিশুর অনুভূতির বিকাশ ও চরিত্রের স্থৈর্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। (২) পিতামাতার আদর্শ, ব্যবহার শিশুমনে প্রগাঢ় ছাপ ফেলে এবং শিশু তাহা অনুকরণ করে। ফলে আদর্শবাদ ও চরিত্রগঠন শৈশবে অনেকখানি পরিবারের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। (৩) এখনও আমাদের দেশে পরিবার অনেকখানি সামাজিক মিলনক্ষেত্ররূপে কাজ করিতেছে। সুতরাং সামাজিক রীতি-নীতি-শিক্ষাও বহুলাংশে পরিবারের সাহায্যে হইয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ শিক্ষায় ধর্ম ও দেবায়তন

সকল দেশে সকল যুগেই ধর্ম এবং দেবায়তন শিক্ষার একটি মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। বস্তুতঃ, ধর্ম এবং দেবায়তনই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যক্ষ শিক্ষা সর্বপ্রথম ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া শাস্ত্রাদি-শিক্ষার জন্য উপাধ্যায়গণ চেষ্টা করিতেন। ইউরোপে মধ্যযুগে প্রত্যক্ষ শিক্ষার ভার পূরাপূরিভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত ছিল। আজও ভারতে কিংবা অন্যান্য দেশে ধর্মপ্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই।

পরোক্ষ শিক্ষায় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অবদান

প্রত্যক্ষ শিক্ষা অপেক্ষা পরোক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও দেবায়তনের প্রয়োজন অত্যধিক। বিশেষ করিয়া ধর্মই আমাদের নীতিবাদের কেন্দ্র। ধর্ম-শিক্ষাকে এবং নীতিশিক্ষাকে অঙ্গাঙ্গী বলিলেও ক্ষতি নাই। বর্তমান যুগে নীতিকে যদিও ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয় তথাপি নীতিকে সাধারণতঃ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন বলা চলে না। ফলে নীতিশিক্ষায় ধর্ম এবং দেবায়তনের অবদান অত্যধিক। ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থাকে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থাও বলা যাইতে পারে। ধর্মসম্বন্ধীয় সাহিত্য এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে, তাহার পাঠ এবং প্রচারের ভিতর দিয়া নীতিশিক্ষা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের বেদপাঠ, পুরাণপাঠ, কথকতা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ধর্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং কুলগুরু তাহার বিশিষ্ট মাধ্যম ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নরনারী দীক্ষাগ্রহণ করিতেন এবং তাহার ফলে গুরুর সংগে তাহাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইত।

নীতিশিক্ষায় ধর্মের স্থান

দেবায়তন, মঠ এবং বিশেষ বিশেষ তীর্থক্ষেত্র অনেকটা একইভাবে আমাদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করিত। দেবালয়ে, মঠে এবং তীর্থক্ষেত্রে লোকে বিশেষভাবে ধর্মপাঠাদি শুনিতে ও সাধুসন্তদের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইত। দেবালয়, মঠাদি এবং তীর্থক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকিত। লোকে ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়া ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং অনেকখানি সামাজিক শিক্ষাও লাভ করিত। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিপ্রচারেও দেবায়তনের স্থান অস্বীকার করা চলে না।

দেবায়তন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা

বর্তমান পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতেও ধর্ম ও দেবায়তনের শিক্ষাকে অবহেলা করা চলে না। ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি, যথা হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও খৃষ্টধর্ম এখনও আমাদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে। নীতিশিক্ষায় ধর্মের প্রভাব ভারত হইতে কোন কালে লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কখন কখনও সামাজিক নীতি ও ধর্মনীতিতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতে পারে। যেমন কোন ধর্মই জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করে নাই। কিন্তু সমাজ নিজ প্রয়োজনে ইহার সৃষ্টি করিয়াছে। তবে আশা করা যাইতেছে যে, সমাজ এবং ধর্ম পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাবে চলিবে। ধর্মের মধ্যে দীর্ঘদিনের যে ক্লেদ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা বিদূরিত হইবে এবং জাতির শিক্ষায় ধর্ম ও দেবায়তন তাহার প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিবে। তাহা না হইলে জাতীয় চরিত্রের বিকাশে যে বিঘ্ন ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্মানুষ্ঠান সামাজিক অনুষ্ঠানও বটে—কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া কৃষ্টিগত শিক্ষাও অনেকখানি হইতে পারে।

শিক্ষায় দেবায়তন প্রভৃতির স্থান

পরোক্ষ শিক্ষার মাধ্যমরূপে সংঘ ও যুব আন্দোলন

পূর্বেই বলা হইয়াছে মানুষে মানুষে মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা সংঘটিত হইয়া থাকে। যেখানে মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্য এবং উন্নততর আদর্শ লইয়া মিলিত হয় এবং পস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও ভাবের আদান-প্রদান করে সেখানে শিক্ষার মহাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘকে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। বিশেষ কোন আদর্শ বা কোন বিশেষ কার্যে আগ্রহ—এইসব সংঘের ভিত্তি।

যেমন— সুস্থ সবল শরীর গঠনের নিমিত্ত ব্যায়াম সমিতি, আবার সমাজ-সেবার আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয় পল্লীমঙ্গল সমিতি। এইরূপ সংঘের সভ্যগণ একই উদ্দেশ্য বা একই বিষয়ে আগ্রহের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সংঘে যোগ-

সংঘ

দান করে ও সংঘের আইন-কানুন এবং ক্রিয়াকলাপাদি ঐ উদ্দেশ্য দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সংঘের সভ্যগণ পরস্পরের মধ্যে পরিচিত নাও হইতে পারে এবং তাহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে ; তথাপি সংঘের প্রত্যেক সভ্যের দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও এক আদর্শের অনুসরণের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে ও একই ধারায় তাহাদের চরিত্রগঠন হইয়া থাকে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এইরূপ সংঘ আমাদের দেশে অনেকটা নূতন, কিন্তু দিন দিনই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতে ইহার প্রসার আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। পরোক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমস্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের অবদান সামান্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান স্কাউট সংঘ, এন. সি. সি., আনন্দমেলা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যুবসংঘের প্রয়োজন বিশেষভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিক্ষণই চরিত্র-শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় বালক-বালিকারা

যুবসংঘ

আদর্শপ্রবণ হইয়া ওঠে। আদর্শ-বিশেষে প্রণোদিত হইয়া কোন যুবসংঘের সভ্যরূপে কাজ করার ফলে তাহাদের চরিত্র অনেকখানি অনুরূপ আদর্শে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইরূপ আন্দোলন বিদ্যালয়ের সংগে সংযুক্ত থাকিয়া চরিত্র-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। দুঃখের বিষয় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যুব আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ যুব আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহা নিতান্ত অভাবনীয়। সমাজ-সেবা বা সাংস্কৃতিক উন্নতি যুব আন্দোলনের ভিত্তি হওয়া উচিত।

চলচ্চিত্র, বেতার ও সংবাদপত্র—পরোক্ষ শিক্ষায় ইহাদের অবদান

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না।

সামাজিক আদর্শে সর্বসাধারণের বিশ্বাস ব্যতীতও শিক্ষার অন্য ব্যাপকতর মাধ্যমের প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের এই সমস্যা-সমাধানে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করিয়াছে। জন-চেতনা জাগ্রত করা এবং তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ ও চরিত্রগঠনের নিমিত্ত চলচ্চিত্র, বেতার ও সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাজের প্রাণকেন্দ্র গ্রামেও ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। এই মাধ্যমগুলি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। শিক্ষামূলক, সমাজ-নীতিমূলক ও কৃষ্টিমূলক চলচ্চিত্র আনন্দের সংগে সংগে জনসাধারণের মনে গভীর ছাপ ফেলিতে সক্ষম হয়। বাস্তবজীবনের ছবি, মানুষের ভুলত্রুটি ও তাহার ফলাফল এবং এই সমস্ত ভুলত্রুটির সমাধানের উপায় যখন দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায়, তাহা পরোক্ষভাবে মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তবে এইসব চিত্র যদি কু-অভিসন্ধিমূলক হয়, তাহা শিক্ষাজগতে বিষময় ফল প্রদর্শন করে। সুতরাং চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারও শিক্ষাজগতে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। বেতারে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বক্তৃতা, ছোটদের আসর, মহিলাদের জন্য বিশেষ আসর ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য বিভিন্ন আসর এবং নৃত্যগীত, অভিনয় ইত্যাদির আয়োজনের মধ্য দিয়া সমস্ত দেশেই ইহা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সহযোগিতাবোধ ইত্যাদি প্রচারে সমর্থ হয়। এক কথায় বলিতে গেলে সুষ্ঠু বেতার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অবদান শিক্ষাজগতে অতুলনীয়। বর্তমানে বিশেষভাবে বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের জন্য School Broadcast-এর ব্যবস্থা হইয়াছে। চলচ্চিত্র ও বেতারের ন্যায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানও তাহাদের নানাকার্যের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-শিক্ষা, চরিত্রশিক্ষা ও সংস্কৃতি-শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতে পারে। পরোক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাদের অবদান অসামান্য। এইসব প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিক্ষা বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শিক্ষার ব্যবস্থা করে না, ইহা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করে। জনগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনা নাই।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে সমাজ

সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাদের স্থান সম্পর্কে উপরি-উক্ত আলোচনাতে দেখা যায় যে, সমাজই শিক্ষার একমাত্র

মাধ্যম। সমাজে বসবাসের দ্বারা আমরা শিক্ষালাভ করি। এইজন্য অনেক সময় আমরা মানুষের দৃষ্টিভংগিতে কিংবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এক সমাজ হইতে অন্য সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই। নাগরিকদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে। যে সমাজে এইরূপ প্রতিষ্ঠান বহু ব্যাপক এবং উপযুক্তরূপে সুনিয়ন্ত্রিত সেই সমাজেরই শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তত অধিক। সমাজ জীবনের প্রতিটি তুচ্ছ কার্যের ভিতর দিয়া আমরা শিক্ষালাভ করি। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই বিশেষভাবে পরিকল্পিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত। অন্যদিকে যে সমাজে এক প্রতিষ্ঠানের সংগে অপর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধভাব থাকে সেই সমাজে শিক্ষা পঙ্গু হইয়া পড়ে। যেমন অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ সহযোগিতাকে জীবনের উন্নতির পথে প্রধান সহায়রূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু যখন তাহারা জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অনবরত প্রতিযোগিতাই দেখিতে পায়। প্রতিযোগিতা দ্বারা ব্যক্তি ধনে-মানে, সম্পদে বড় হইয়া ওঠে। এই যে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আদর্শের বিরোধ তাহাতে শিক্ষা বাধা পায়—মানুষ সত্যকে কোন সময়েই গ্রহণ করিতে পারে না; আবার সমাজও সুন্দর ও সুখী হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না।

আবার যে সমাজের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থহীন সেই সমাজের শিক্ষাও পঙ্গু হইয়া পড়ে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং তাহার বাধা-নিষেধ যদি সমাজের সভ্যদের প্রয়োজন-নিবৃত্তির সহায়ক না হয়, তবে সামাজিক কার্য্যকলাপ অর্থহীন হইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও পরোক্ষ শিক্ষার স্বরূপ কি? শিক্ষার একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করুন।

২। সমালোচনা করুন:—'জ্ঞানার্জনই শিক্ষা নহে।' 'নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্য দিয়া জ্ঞানলাভই শিক্ষা নহে।' 'শিশুর উপর বয়স্কদের প্রভাব শিক্ষা নহে।'

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবার, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, যুব আন্দোলন, বেতার, চলচ্চিত্র ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান—ইহাদের অবদান কি?

৪। শিক্ষায় বিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। বিদ্যালয় একটি সমাজ বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে বিদ্যালয়কে একটি শিক্ষাপ্রদ সমাজরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার উদ্দেশ্য

"The aim of education is to make man grow. It is man-making education all round, that we want."

—*Swami Vivekananda*.

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, মনুষ্য-জীবনে শিক্ষার শেষ নাই। জীবনের প্রতি মুহূর্ত, প্রতি অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট নূতন নূতন শিক্ষা আনিয়া দিতেছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকার ভেদ আছে। আমরা সুশিক্ষা ও কুশিক্ষার পার্থক্য করিয়া থাকি। কিন্তু কাহাকে সুশিক্ষা বলে, কাহাকে কুশিক্ষা বলে তাহা বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ভিন্ন অন্য সকল শিক্ষাকেই প্রায় কুশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হইত। যে ছেলে খেলাধূলায় বা শিল্পকলায় কিছুমাত্র আকর্ষণ প্রকাশ করিত শিক্ষক কিংবা পিতামাতা তাহার আচরণের সংশোধনে তৎপর হইতেন; কিন্তু বর্তমানে ঐগুলিকেই সুশিক্ষা বলা হয়। মোটকথা, কাহাকে সুশিক্ষা ও কাহাকে কুশিক্ষা বলা হইবে তাহা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের ব্যবহারের পরিবর্তনকেই সাধারণভাবে শিক্ষা বলা হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার ব্যবহারের পরিবর্তনকে সুশিক্ষা বলা চলে না। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতিও ব্যবহারের পরিবর্তন। তথাপি ইহাদিগকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে কি? ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের আদর্শের অনুকূল যে ব্যবহারের পরিবর্তন তাহাই শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের বিচার করিতে হইবে। শিক্ষার মূল্য শিক্ষার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। (স্থান-কাল-ও-পাত্র-ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হইতে পারে। যাহা হউক, কি শিক্ষা দিব ইহা স্থির করিবার পূর্বে কেন শিক্ষা দিব তাহা স্থির করা প্রয়োজন।)

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মানুষকে প্রস্তুত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের জীবনের শুভাশুভের উপর শিক্ষার ভালমন্দ নির্ভর করে। জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে না পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যও স্থির করা কঠিন। আবার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইলে এই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেকখানি জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে।

জীবনদর্শন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

(১) প্রধানতঃ, তিনটি জীবনদর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদকেই প্রাচীনতম জীবনদর্শন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম এবং তাহাদের শাস্ত্র ও দর্শন এই বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম আদর্শবাদী পৃথিবীর একমাত্র স্রষ্টারূপে ভগবানে বিশ্বাসী। ভগবদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্টি এবং প্রতিটি জীবাত্মা, পরমাত্মা বা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাঁহার কার্যসাধনেই তাহাদের জীবনের সার্থকতা। পরমাত্মা ব্যতীত জীবাত্মার কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, জীবাত্মায় সত্য শিব ও সুন্দরের প্রকাশ তাঁহার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। সৎ-অসতের বিচার পরমাত্মা হইতেই আসিয়া থাকে। তিনি সর্বগুণাকর। তাঁহার গুণসমষ্টি শাশ্বত—স্থান, কাল এবং ব্যক্তির পরিবর্তনে তাঁহার কোন পরিবর্তন হয় না। মনুষ্যজীবনে ভগবদ্-গুণাবলী প্রতিফলিত হইলেই তাহাদের জীবন সার্থক হয়। আদর্শবাদীরা স্থূল জগৎ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জগতের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। জীবনকে তাহারা অবিনশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। মৃত্যুতে জীবনের শেষ ইহা তাহারা বিশ্বাস করেন না।

আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ

আদর্শ অধ্যাত্মবাদিগণ ভগবদ্-অভিপ্রেত চরিত্রগঠনকেই বিশেষভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করেন। সকল দেশে সকল সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য মোটামুটি এক, ইহাই তাহাদের ধারণা। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি মনুষ্যজীবনের তথা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পরিণতি। (প্রতি মানুষকেই ভগবান্ নির্দিষ্ট প্রবণতার অধিকারী করিয়া জন্ম দেন। উহাদের পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা মানুষকে নূতন করিয়া গড়িতে পারে না। ভগবদ্দত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশে সাহায্যমাত্র করিতে পারে।\ ভগবান্ কর্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বের মঙ্গলসাধনের নিমিত্তই মানুষের জন্ম। সুতরাং ভগবৎ-প্রদত্ত শরীর,

আদর্শবাদ শিক্ষার লক্ষ্য

মন, বুদ্ধি, ধর্ম, নীতি ও আত্মার সুষ্ঠু বিকাশ ও সত্য-শিব-সুন্দরের উপলব্ধিই মনুষ্যজীবনে শিক্ষার লক্ষ্য।

বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে জড়োবাদ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দিনদিনই জড়ো প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এইরূপ প্রভুত্বের দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জড়োবাদ

ফলে জড়ো প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব অনেক বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন না। আত্মা, জীবন প্রভৃতিকে জড়ো প্রকৃতির সাহায্যেই বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে। ফলে জড়োবাদ জীবন-দর্শনরূপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। জড়োবাদ কোন স্রষ্টা বা ভগবানে বিশ্বাস করে না। প্রাকৃতিক নিয়মেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি স্বাধীন সত্তা। পরমাত্মা, ঈশ্বর, বা অনুরূপ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার উপরে মানুষ নির্ভর করে না। বিভিন্ন রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে যে যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয় মানুষকে তাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যৌগিক পদার্থটি যে বিশিষ্ট গুণের অধিকারী হইল তাহা বিভিন্ন সংমিশ্রণের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না। সংমিশ্রণের ফলে ইহাতে নূতন গুণের প্রকাশ হইতে পারে, যেমন—জল। যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা জলের সৃষ্টি সেইগুলির গুণাগুণের উপর জলের ধর্ম নির্ভর করে না। সংমিশ্রণের ফলে জলের একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ রূপ প্রকাশ পায়। মানুষও সেইরূপ কতকগুলি বিভিন্ন অণু-পরমাণুর সংমিশ্রণের ফল। জীবন, মন ইত্যাদি এই মিশ্রিত অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে পৃথক্ করিয়া না থাকিলেও সম্পূর্ণ মানুষটির মধ্যে আছে। মানুষ একটি আকস্মিক সৃষ্টি। সুতরাং জড়ো-বাদিগণ আশা করেন সংমিশ্রণের এই হিসাবটি জানিতে পারিলে তাঁহারাও কোন-না-কোনদিন জীবন সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাঁহারা মনে করেন মৃত্যুর সংগে সংগেই মানুষের সব শেষ হইয়া যায়।

জড়োবাদ জীবনকালের গুরুত্বকেই সর্বাধিক মনে করেন। পার্থিব জীবনের

জড়োবাদ শিক্ষার উদ্দেশ্য

বাহিরে কোন অতীন্দ্রিয় জীবনের কল্পনা বাতুলতা ভিন্ন কিছু নয়। পার্থিব জীবনকে সুন্দর, শুভকর ও সুখী করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইজন্য যে সমস্ত জ্ঞান ও যে সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী এই কার্যের সহায়ক তাহাই বিশেষ-ভাবে শিক্ষণীয়। সু ও কু, ভাল ও মন্দ পার্থিব বিচারের দ্বারাই স্থির

করিতে হইবে। পার্থিব জীবনের দুইটি দিক—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। সমাজ দ্বারাই মানুষের মন গঠিত। সমাজের ভালমন্দেই মানুষের ভালমন্দ। সমাজ ব্যতীত মানুষের মনের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, জীবনও নাই। সাধারণতঃ সমাজের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণতাই সদসৎ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং মানবকে সমাজ-জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পিতামাতা রূপে, স্বামি-স্ত্রীরূপে, প্রতিবেশি-হিসাবে এবং জাতীয় ঐশ্বর্যের ধারক ও বাহক-রূপে প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য।

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদ বিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ অবদান। আমেরিকাতে ইহার আবিষ্কার এবং ঐ দেশের দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্‌গণই বিশেষভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই 'বাদ'কে একটি সম্পূর্ণ জীবনদর্শন বলা হয়তো ঠিক নয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভংগি দ্বারা বিচার করাই এই 'বাদ'-এর বৈশিষ্ট্য। সেইদিক হইতে ইহাকে জীবন-প্রণালী বলা যাইতে পারে। কোথাও কোথাও আদর্শবাদ দ্বারা আবার কোথাও জড়োবাদ দ্বারা ইহা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

অবস্থানুসারে ব্যবস্থাবাদ

এই 'বাদ' কোন সুস্থির বা সুনির্দিষ্ট শাশ্বত গুণ বা ধর্মে বিশ্বাস করে না। ইহা জীবনের কোন দিকের সমাপ্তিতে বিশ্বাস করে না। যতি নয়,—গতিই ইহার ধর্ম। মানুষের জীবন কখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, প্রতিনিয়তই ক্রমবিকাশের পথে ইহা প্রগতিশীল। জড়োবাদের ন্যায় সংকীর্ণ গণ্ডী টানিয়া ইহা জীবনকে সীমাবদ্ধ করিতে প্রস্তুত নয়। কি জড়ো জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে—কোথাও সীমার গণ্ডী টানা চলে না। হয়তো বা কোথাও জড়ো জগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া আছে। ইহা মানবধর্মী বলিয়া নিজেকে প্রচার করে। কার্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়াই মানুষ নিজের ধর্ম ও আদর্শ সৃষ্টি করিয়া চলে। সৎ, অসতের বিচারকে এই মতাবলম্বীরা বস্তু-আপেক্ষিক করিয়া দেখেন। যাহা ভাল তাহা চিরকালই ভাল, যাহা সুন্দর তাহা চিরকালই সুন্দর – ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। একের পক্ষে যাহা শুভ অপরের পক্ষে তাহা শুভকর না হইতেও পারে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে দেশ-কাল-ও-পাত্রের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হয়। সুতরাং কোন্‌টি ভাল অথবা কোন্‌টি মন্দ তাহা আমরা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। যাহা কিছু জীবনকে

অধিকতর উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করে তাহাই ভাল এবং যাহা তাহাতে বাধা সৃষ্টি করে তাহাই মন্দ। জীবনের সাফল্যই সৎ অথবা অসতের বিচারের মাপকাঠি। সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভাল-মন্দ স্থির করিতে হইবে। জীবনকে ইহারা একটি মহাপরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন। সব সময়েই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব লইয়া বিচার করিতে হইবে। তাই এই মতবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মতবাদ (Experimentalism) আখ্যাও দেওয়া যায়।

অবস্থা-অনুসারে ব্যবস্থাবাদ ও শিক্ষা

অবস্থা-অনুসারে-ব্যবস্থাবাদিগণ শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করিতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও অধিকতর শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দেশ-কাল-ও-পাত্রের বিভিন্নতার উপরে শিক্ষা নির্ভরশীল। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের নিকট শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই। তাহাদের মতে, শিশু ও শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব জীবনকে পরখ ও যাচাই করিতে দেওয়া উচিত; কিন্তু শিশু ও শিক্ষার্থীর সম্মুখে কোন আদর্শ উপস্থাপনের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রবণতা, শক্তি, আসক্তি প্রভৃতির গতির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি যে-সকল অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে, উহা মিটাইবার শক্তির অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। মনের গতিশীলতা রক্ষা ও জীবনের যে কোন অবস্থা কিংবা পরিবেশে উদ্যম, উৎসাহ ও দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুতিই তাঁহারা শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। চিন্তা অপেক্ষা কাজের উপর এই 'বাদ' অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এই মতবাদের একটি বিশেষ নীতি।

বিভিন্ন যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা শিক্ষাই নয়। উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হইলেও যে-কোন শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে তাহার উদ্দেশ্য স্বতঃই প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আদর্শবাদী জীবনদর্শন শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জ্ঞানকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ধরা হইত—'পরা' ও 'অপরা'।

জড়োজ্ঞানকে 'অপরা' ও অধ্যাত্মজ্ঞানকে 'পরা' জ্ঞান বলা হইত। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। বেদ, উপনিষদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য-পালন, এবং অন্যান্য ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানাদির ভিতর দিয়া পরাজ্ঞান লাভ ও ভগবদুপলব্ধি হইত। জড়োজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অবহেলা না করা হইলেও সর্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্বনিয়ন্তা বা ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবাত্মা যে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার অধীন এ সম্পর্কে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে বারংবার আবৃত্তি দ্বারা, গুরুসেবার দ্বারা, ব্রহ্মচর্যপালন কিংবা উপাসনা দ্বারা অন্তরে জ্ঞান উপলব্ধি করাই তাঁহারা শিক্ষার পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিতেন। আত্মোপ-লব্ধিই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। ভগবদ্‌দত্ত ও জন্মগত প্রবণতার বিভিন্নতা হিসাবে বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইত। সমাজে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন (পরাজ্ঞান) তাহা প্রাসঙ্গিকভাবে দেওয়া হইত—শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইত না।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের পরে প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাধারাই ইউরোপের শিক্ষাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে এবং বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর ইউরোপের শিক্ষার প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। প্রাচীন গ্রীসে স্পার্টা এবং এথেন্সের দুইটি বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন স্পার্টা ও এথেন্সের অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল, শিক্ষাক্ষেত্রেও এই দুইটি দেশ পরস্পরবিরোধী শিক্ষার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় জড়োবাদী জীবনদর্শনের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। স্পার্টানগণ ভারতীয়দের মত কোন অতিন্দ্রীয় জীবনে বিশ্বাস করিত না। জড়োজগৎকে এবং এই মরজগতের জীবনযাত্রাকে তাহারা শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পার্থিব জীবনযাত্রার

প্রাচীন স্পার্টানদের শিক্ষার লক্ষ্য

মধ্যে ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা রাষ্ট্রজীবনের উপরেই তাহারা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। পরমাত্মার উপরে জীবাত্মার নির্ভরশীলতায় বিশ্বাসী না হইলেও তাহারা ব্যক্তিজীবনকে রাষ্ট্রজীবনের নিকট সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলিয়া মনে করিত। রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনকে এবং রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিকরূপে ইহার সেবায়

সর্বশক্তি নিয়োজিত করাকে তাহারা জীবন তথা শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। জন্মমাত্র শিশুর উপর রাষ্ট্রের অধিকার জন্মাইত এবং সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করার সংগে সংগে শিশুকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাষ্ট্র তাহার শিক্ষার সকল ভার গ্রহণ করিত। বিকলাঙ্গ বা শারীরিক দিকে অক্ষম শিশুদের রাষ্ট্রের বোঝাস্বরূপ মনে করিয়া পৃথিবী হইতেই তাহাদের সরাইয়া ফেলা হইত। পৃথিবীতে দুর্বলের স্থান নাই—এই ছিল তাহাদের মত। সৈন্যবাহিনীর উপর রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হয়; এইজন্য স্পার্টান শিশুদের বিশেষভাবে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত। এমনকি যে-সব ব্যবহার আমরা সাধারণতঃ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করি সৈনিকের জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া স্পার্টান শিশুকে সেইরূপ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হইত। সাহিত্য, কৃষ্টি, কলা, প্রভৃতি আত্মোন্নতিমূলক বিষয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন গুরুত্ব আরোপ করা হইত না। প্রতিটি স্পার্টান শিশু মোটামুটি একই ছাঁদে মানুষ হইয়া একই বৃত্তি গ্রহণ করিত এবং প্রায় একভাবে একমাত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জীবন নির্বাহ করিত।

প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা আদর্শবাদী জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। সক্রেটিস্, এরিষ্টটল, প্লেটো প্রভৃতির মত দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ্ এথেন্সের শিক্ষাধারার নিয়ামক ছিলেন। স্থূল এবং বাহ্য জীবন অপেক্ষা অতিন্দ্রীয় জীবনকে এথেন্সবাসীরা সর্বদাই প্রাধান্য দিত। এক বা অবিনশ্বর পরমাত্মার কথা স্পষ্টভাবে না বলিলেও তাহারা শাশ্বত ও অতিন্দ্রীয় গুণাবলীতে বিশ্বাস করিত। এই অতিন্দ্রীয় গুণাবলীর উপলব্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই গুণাবলীর মধ্যে এরিষ্টটল বিশেষ করিয়া 'সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্'-এর উপর জোর দিতেন। সমষ্টিজীবন অপেক্ষা ব্যক্তিজীবনের উপরই এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। 'সত্য, শিব ও সুন্দর' কে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই উপলব্ধিই মনুষ্যজীবনে শিক্ষার আদর্শ। এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থাতে তাই সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির প্রাধান্য ছিল। শিক্ষাও রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল না। প্রতি নাগরিক তাহার জন্মগত ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তির অনুসারে নিজ অভিরুচির অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিত।

প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা

রোমানগণ এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। পরিপূর্ণ আত্মবিকাশকে তাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিত। বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনীতিতে এবং আইনশাস্ত্রে রোমানগণ বিশেষভাবে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাই আইন এবং রাজনীতির শিক্ষা রোমানদের শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন রোমের শিক্ষাব্যবস্থা

মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থাও আদর্শবাদী জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন মানুষ বা জীবাত্মাকে প্রাধান্য দিয়াছিল মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা তাহা করে নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে যে স্থান দিয়াছিল উহারা তাহাও দেয় নাই। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মা কর্তৃক পরমাত্মার উপলব্ধির ক্ষমতাকে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় খৃষ্টদর্শন তাহা স্বীকার করে নাই। আদর্শবাদী হিসাবে তাহারা স্রষ্টা বা ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জগৎ—ইহাও তাহারা স্বীকার করে। কিন্তু সোজাসুজিভাবে মানুষের ভগবদ্-উপলব্ধির ক্ষমতা আছে ইহা তাহারা স্বীকার করে না। মানুষ প্রায় সর্বদাই পাপে লিপ্ত থাকে। যখন সে নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্তচিত্তে ভগবানের ক্ষমা প্রার্থনা করে তখনই তাহার সত্য জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। সুতরাং মধ্য-যুগীয় ইউরোপীয় শিক্ষা, ধর্মগ্রন্থাদিপাঠ, আত্মশাসন, অনুতাপ এবং প্রার্থনাকে বিশেষভাবে শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউরোপে মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা

নবজাগরণের সূচনাতে ইউরোপের মধ্যযুগের অবসান ঘটে। ইহার পর মানব-প্রকৃতিবিদ্‌গণ (Humanist) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেন। তাঁহারাও আদর্শবাদী ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা আত্মশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না। এথেন্সবাসীদের ন্যায় বাস্তব জগতের বাহিরে অতীন্দ্রিয় জগতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের মধ্যেই তাঁহারা অতীন্দ্রিয় জীবনের গুরুত্ব আরোপ করিতেন। মূলতঃ তাঁহারা প্রাচীন এথেন্সের শিক্ষার আদর্শকেই নিজেদের শিক্ষার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয় জীবনের উপলব্ধির উপায় হিসাবে বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশকেই তাহারা শিক্ষার লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধি, স্মরণশক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিতে মনকে

নবজাগরণের যুগ

তাহারা বিভক্ত করিতেন এবং প্রাচীন ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যপাঠের দ্বারা ঐ বৃত্তিগুলির সম্যক্ বিকাশ সাধিত হয় বলিয়া তাহারা অনুমান করিতেন। বস্তুতঃক্ষেত্রে Humanistদের শিক্ষাব্যবস্থায় ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রামার এবং অনেকটা উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যপাঠ প্রভাব বিস্তার করে।

প্রকৃতিবাদের প্রভাব

মানব প্রকৃতি-অনুশীলনকারীদের (Humanist) পুস্তকের উপর অতিরিক্ত গুরুত্বের প্রতিবাদ হিসাবে প্রকৃতিবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে। বস্তুতঃপক্ষে হিউমেনিষ্ট শিক্ষার সহিত জীবনের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা অর্থহীন ল্যাটিন ও গ্রীক ব্যাকরণ শিক্ষায় পর্যবসিত হয়। শিক্ষাকে অধিকতর মানবীয় করার পরিবর্তে শিক্ষাকে জীবন হইতে আরও সরাইয়া লওয়া হয় এবং এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রগণ কতকগুলি অর্থহীন বুলি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে মাত্র। ফলে এই শিক্ষার ভিতর দিয়া যাহারা সমাজে প্রবেশ করেন তাঁহারা সমাজ-জীবন বিশেষভাবে কৃত্রিম করিয়া তোলেন। অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অভিজাত-সমাজ বিশেষভাবে এই বিদ্যানুরাগীদের শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে রুশো

মনীষী রুশো বিশেষ করিয়া এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। তিনি কৃত্রিম জীবনধারা হইতে "প্রাকৃতিক" জীবনধারায় প্রত্যাবর্তন করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার Emile নামক গ্রন্থে তিনি প্রকৃতিবাদী শিক্ষার প্রচার করেন। ছাত্রজীবনকে রুশো চারিভাগে বিভক্ত করেন—(১) ৫ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত শৈশব, (২) ৭ থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত বাল্য, (৩) ১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর ও (৪) ১৪ বৎসরের পর থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণ ধরা হয়। শিশুর শিক্ষাকে প্রকৃতির সংগে সমান তালে চলিতে হইবে—বিভিন্ন বয়সে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইবে। শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে প্রাকৃতিক নিয়মকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। পাঁচ বৎসর হইতে বারো বৎসর পর্যন্ত রুশো অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার (Negative education) সময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকরূপে কোন পুস্তক থাকা উচিত নয়। প্রকৃতির কোলে শিশু লালিত-পালিত হইবে এবং প্রকৃতিই তাহাদের শিক্ষয়িত্রী হইবেন। প্রকৃতির সাহচর্যেই তাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তির সম্যক বিকাশ সাধিত হইবে, এবং ইহার ফলে তাহারা ভবিষ্যতে শিক্ষাগ্রহণে উপযুক্ত হইবে। অপ্রত্যক্ষ শিক্ষার কালই শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ হইবে।

কৈশোরে শিশু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তখনও পুঁথিগত বিদ্যাকে প্রাধান্য দিলে চলিবে না। প্রকৃতি-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্যই পুস্তক থাকিবে। সামাজিক শিক্ষাদানের সময় তখনও হয় না। যথা-সম্ভব প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু কৈশোর হইতে বয়ঃসন্ধিক্ষণে পদার্পণ করিবে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে বিশেষ করিয়া সামাজিক শিক্ষা দিতে হইবে। যৌনব্যবহার সম্বন্ধে সামাজিক রীতি-নীতি-শিক্ষা এই সময়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদ্যায়তনের শিক্ষাকে রুশো পছন্দ করিতেন না। তাঁহার আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের স্থান নাই। কিন্তু গৃহশিক্ষকের সাহায্য গ্রহণকে রুশো সমর্থন করিতেন। এমিল কখনও বিদ্যালয়ে যান নাই; এবং জীবনের বিভিন্ন কাল এমিল প্রাকৃতিক নিয়মকে সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য গৃহ-শিক্ষকের সাহায্য যদিও গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি প্রকৃতিই তাঁহার প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সামাজিক শিক্ষাকে রুশো বিশেষভাবে ভয় করিতেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মানুষ ফুলের মত পবিত্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশই তাহাকে পাপ ও অধঃপতনের পথে লইয়া যায়। এই কারণে যৌনশিক্ষা ব্যতীত অপর কোন সামাজিক শিক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহা ব্যতীতও শিক্ষাব্যবস্থায় শাসন-ব্যাপারে শিক্ষকের হস্তক্ষেপকে তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে শিক্ষক ছাত্রকে পর্যবেক্ষণ করিবেন, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহাকে জোর করিয়া বাধা দিবেন না। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে প্রকৃতি নিজেই শিশুকে শাসন করিয়া সত্য পথে ফিরাইয়া আনিবে। যেমন আগুনে হাত দিলে হাত যে পুড়িবে এই জ্ঞান তাহারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করিবে।

রুশোর মতে স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থা অনুরূপ হওয়া উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রকৃতি নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে গঠন করিয়াছে এবং তাহাদের সামাজিক জীবনের উদ্দেশ্যও ভিন্নরূপ। সুতরাং 'এমিল' পুস্তকে 'সফিয়া' নামে একটি মেয়ের শিক্ষাব্যবস্থা রুশো পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এমিলের ন্যায় সফিয়ার বিস্তারিত কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তাহার শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এমিলের উপযুক্ত স্ত্রী হইতে সমর্থ হওয়া। নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শকে রুশো এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রুশোর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মতবাদ বিশেষভাবে 'প্রকৃতিবাদ' নামে খ্যাত।

এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী; খেলাধূলা ও নিজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজকর্মের ভিতর দিয়াই শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে; শিক্ষকের স্থান এখানে গৌণ। তিনি শুধু শিক্ষার্থীর পরামর্শদাতা, কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থীর ইচ্ছাকে তিনি জোর করিয়া অবদমিত করেন না। পুস্তকের উপর গুরুত্ব যথাসম্ভব কম দেওয়া হয় এবং শিক্ষাসময়ে শিক্ষার্থীকে সামাজিক প্রভাব হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রকৃতির সহিত শিশুর অন্তরঙ্গ সাহচর্যই শিক্ষাব্যবস্থায় অপরিহার্য বলিয়া মনে করা হয়।

যদিও রুশোর মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের সৃষ্টি করে, কিন্তু স্বাধীন মতবাদ হিসাবে এই 'বাদ' অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। রুশো নিজে কখনও শিক্ষক ছিলেন না। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তিনি তাঁহার 'এমিল' রচনা করেন নাই। তৎকালীন ফরাসী সমাজের পরিবর্তনই তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির ফলে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক সত্যের উপলব্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাহার কল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক দোষ-ত্রুটি ছিল। ফলে তাহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সত্যোপলব্ধিগুলি পরবর্তী শিক্ষাবিদ্গণ গ্রহণ করিলেও তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মতবাদ পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নাই।

প্রকৃতিবাদে শিক্ষার অবদান

আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্গণ প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবেই ইহাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। শিশুর শিক্ষা যে তাহার বয়সের উপর নির্ভরশীল ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না; শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দানকেও তাঁহারা বিশেষভাবে পছন্দ করিয়াছেন; শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে রুশোর মতবাদও তাঁহারা সমর্থন করেন। এই সম্পর্কে বিশেষভাবে পেষ্টালজী ও ফ্রবেলের নাম করা যাইতে পারে। অপরদিকে জড়োবাদী শিক্ষাবিদ্গণও রুশোর মতবাদের কিছু কিছু গ্রহণ করেন। জড়োবাদীরা মনে করেন ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মানুষ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং কোন জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাহিরে নয়। এইজন্য প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বিশেষভাবে সচেতন করা ও ইহার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতিই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা মন্টেসরী শিশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। অপরদিকে প্রকৃতির উপর রুশোর অগাধ বিশ্বাসে প্রভাবান্বিত হইয়া প্রকৃতি ও তাহার নিয়মকে জানিবার জন্য অনেকের মনে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ফলে জড়ো বিজ্ঞানের

দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। ইহার উন্নতির সংগে সংগে জড়োবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন ভাব-ধারা প্রবেশ করে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীবিপ্লব হইতে গণতন্ত্রের সৃষ্টি হইলেও উনবিংশ শতাব্দীতেই ইহার বিশেষ প্রসার এবং ইহাকে গণতন্ত্রের যুগ বলা চলে। শিল্পবিপ্লব ও শ্রম-বিভাগের চরম পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীতেই দেখা যায়। ফলে মানুষে মানুষে পার্থক্যে লোকের বিশ্বাস কমিতে থাকে এবং সমাজে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দৃঢ়তর হইতে থাকে। একক মানুষের বিশেষ কোন মূল্য নাই। অপরের সহযোগিতা ব্যতীত তাহার ক্ষমতাও সামান্য। মানুষ কতকগুলি প্রকৃতিদত্ত গুণের অধিকারী হইলেও সমাজ-জীবনে বসবাসের ভিতর দিয়াই তাহার স্বকীয় গুণাবলী বিকাশলাভ করে। সমাজ ব্যতীত মানুষের জীবনের কোন মুল্য নাই, তাহার কর্মেরও কোন ক্ষেত্র নাই। জড়োবাদ এই সমাজতন্ত্র-বাদের সহিত মিলিত হইয়া ইহাকে বিশেষ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। সমাজ-জীবন যদিও ব্যক্তিজীবন অপেক্ষা ব্যাপকতর তথাপি তাহাতে কোন ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার স্থান নাই। সমাজতন্ত্রবাদীরা ঈশ্বর, পরজন্ম বা কোন ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে অধিক বিশ্বাসী নয়। ফলে জড়োবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থারূপে নিজেকে প্রকাশ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ

বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইলে বিশেষভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে অনুধাবন করিতে হইবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সহস্র বৎসর ধরিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থা হইতে অধুনাতন বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায়ও তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, পেষ্টালজী, ফ্রবেল ও মণ্টেসরী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। নান্ সাহেব তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তকে বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ভারতের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বিশেষভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক ছিলেন। সাধারণতঃ পশ্চিমী গণতন্ত্রপন্থী দেশগুলির শিক্ষাধারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমাজ-তন্ত্র মতবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শবাদী জীবনদর্শন হইতে উদ্ভূত। শিশু নির্দিষ্ট

গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং এই গুণাবলীর বিকাশসাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য—ইহাই স্বাতন্ত্র্যবাদীদের বিশ্বাস। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। যেমন—"ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করাই শিক্ষার লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of individual potentialities), আত্মপোলব্ধিই শিক্ষা (Education is self-realization)" ইত্যাদি। শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে ইহাদের মত এই যে, শিশু প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশসাধন করিবে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষক সাহায্যকারী মাত্র। শিশুর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর কোন পরিবর্তনসাধনে তিনি সক্ষম নহেন। ফ্রবেল তাই শিক্ষককে বাগানের মালীর সহিত এবং বিদ্যালয়কে বাগানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শিশুরা সেই বাগানের ফুল। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহারা কেউ বা গোলাপ, কেউ বা পদ্ম, আবার কেউ বা যুঁই-এর মত হইয়া বিকশিত হইবে। এক ফুলকে অন্য ফুলে রূপান্তরিত করা শিক্ষকের ক্ষমতার বাহিরে। সময়মত উপযুক্ত সাহায্যের দ্বারা তিনি শুধু শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করিতে পারেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থা তাই শিশুকেন্দ্রিক, শিক্ষক-কেন্দ্রিক নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে শিক্ষার লক্ষ্য

শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কোন প্রয়োজন বা কোন দাবীর নিকটই শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বলি দেওয়া চলে না; সমাজের দাবী অপেক্ষা শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মানুষের অবদানে সমাজ গঠিত হইয়া থাকে। মানুষের অবদানেই সমাজ উন্নততর এবং পূর্ণ বিকশিত হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের দাবী অপেক্ষা ব্যক্তির দাবী প্রবল। নান্ সাহেব শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করিতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের অবদান ভিন্ন সমাজের উন্নতি কখনই সম্ভব নহে। আমাদের দেশের ও সমাজের উন্নতির মূলেও আছে প্রাচীন ঋষিগণের, কবি, সাহিত্যিক ও মনীষিগণের, বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-গণের, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্রের মত রাজনীতিকগণের, জগদীশচন্দ্র, সি. ভি. রমণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের যুগ যুগ ব্যাপী অবদান। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্তির সহিত জড়িত, শিক্ষালাভের পন্থাও মানুষের অন্তরে উপলব্ধি করার বস্তু। প্রাচীন ভারতবর্ষে দার্শনিকগণ জ্ঞানকে বিশেষ করিয়া আন্তরিক উপলব্ধির বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সত্যজ্ঞান অন্তরের উপলব্ধি হইতে প্রাপ্ত। এইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুকে নিজের ইচ্ছানুসারে অগ্রসর হইতে দেন। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রবৃত্তি দমন না করাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। শিশু আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া আপন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। পাঠ্যবিষয়ও পূর্ব হইতে কঠোরভাবে নির্ধারিত করিয়া রাখাতে ইঁহারা বিশ্বাসী নহেন। শিশু আপন পছন্দ-অপছন্দ এবং অনুরাগ হিসাবে নিজের পাঠ্যবস্তু নির্ধারিত করিবে। শিশুর মানসিক বিকাশ ও অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের সংগে পাঠ্যবস্তুকে খাপ খাওয়ানোই পাঠ্যতালিকা নির্ধারণের প্রধান সমস্যা। শিশুর ক্ষমতা ও রুচির বিভিন্নতা হিসাবে পাঠ্যতালিকা নির্বাচিত করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে শিক্ষাপদ্ধতি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী না হইলেও কেহই শিক্ষাক্ষেত্রে উহার অবদানকে অস্বীকার করিতে পারেন না। শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা হইতে শিশুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই বাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-মনস্তত্ত্বের স্থান-সম্পর্কে এই বাদই আমাদের সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। শিশুমনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা চলিতেছে। এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং শিশুমনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া শিশু-শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্তই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। শৃঙ্খলা-রক্ষা-সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান। পূর্বে কঠোরভাবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করিবার জন্য শিশুর স্বাধীন ইচ্ছাকে দমন করা হইত। শ্রেণীতে ছাত্রগণ স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও জড়বৎ চুপ করিয়া থাকিবে এবং শিক্ষকের বক্তব্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকিলেও তাহা অনুধাবন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, অন্যথায় কঠোর শাস্তিলাভ করিবে—ইহাই ছিল আমাদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানে শিশু-প্রকৃতিকে দমন করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষায় কেহ বিশ্বাসী নহে। বরং শিশুকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে দেওয়া এবং শিক্ষকের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অবদান

বক্তব্য শিশুমনের উপযুক্ত করিয়া তোলা শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া মনে করা হয়। জোর করিয়া কোন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নয়, বিষয়বস্তুতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও অনুরাগ থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। পাঠ্যতালিকাকে শিশুমনস্তত্ত্বের অনুসরণে গড়িয়া না তুলিলে শিক্ষায় সাফল্য সম্ভব নয়।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের শিক্ষাদর্শন

কিন্তু সকল শিক্ষাবিদ্ই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেন এমন নহে। শিশু নির্দিষ্ট গুণাবলী লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই গুণাবলী পরিবর্তন করা সম্ভব নয়—ইহা সমাজতন্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের মতে শিশুমন সাধারণতঃ শূন্যই থাকে। তাহার মনের ভাবধারা ও বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি সে সমাজ হইতেই গ্রহণ করে। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজের শিশুরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া গড়িয়া উঠে। একই সমাজে, এমনকি একই পরিবারের পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য শিশুর প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির ইচ্ছা-পূরণের জন্য শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি জন্মকালেই শিশুকে নির্দিষ্ট গুণাবলী দিয়া জন্ম দিয়াছে; সুতরাং শিশুর ঐ গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি,—ইহা সমাজতন্ত্রবাদিগণ স্বীকার করেন না। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযুক্ত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যুগ যুগ ধরিয়া সমাজ যে সব জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে ও কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, যে সব ভাবধারা ও আদর্শবাদ গ্রহণ করিয়াছে, শিশুমনে তাহা সিঞ্চিত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান —সমাজই ইহা স্থাপন করিয়াছে এবং আপন প্রয়োজনে ইহার ব্যয় নির্বাহ করিতেছে। শিক্ষা দ্বারা সমাজের পরিবর্তন না হইয়া তাহার স্থিতিই সাধিত হইবে। শিক্ষা গতানুগতিকতার ধারক ও বাহক। আবার সাম্যবাদীদিগকে উগ্রসমাজতন্ত্রবাদী আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে। উঁহারা বিপ্লবের দ্বারা সমাজের পরিবর্তনে বিশ্বাসী। সাম্যবাদের ঋষি কার্ল মার্কসের মতে সামাজিক নিয়মানুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামের ফলে সমাজ-বিপ্লব অবধারিত। বিপ্লবী সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে বিপ্লবী নীতিকে সমগ্র সমাজের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষাই তাহার একমাত্র মাধ্যম।

সমাজতন্ত্রবাদীরা পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করিলেও সামাজিক প্রয়োজনকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া

থাকেন। তাঁহাদের মতে সমাজই শিশুর একমাত্র পুস্তক। সামাজিক জ্ঞান, কৌশল ও চিন্তাধারার কথা বিবেচনা করিয়াই পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শিশুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরাগ-বিরাগকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর অনুকূল করা কঠিন নয়। বস্তুতঃপক্ষে শিশু ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি সহ জন্মগ্রহণ করে না। তাহার পারিপার্শ্বিকের উপরই ঐগুলি নির্ভর করে। সমাজের ছাঁচে শিশুকে গড়িয়া তোলা কিছু কঠিন কাজ নহে। সমাজ-জীবনে যে সব বিষয়বস্তুর প্রয়োজন, পাঠ্যতালিকাতেও তাহা সন্নিবেশিত হইবে। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ ডিউই বিশেষভাবে এই মতের পরিপোষক। মহাত্মা গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

সমাজতন্ত্রবাদে শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সমাজের সংঙ্গে সর্বদা আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই শিশু শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

সামাজিক জ্ঞানলাভই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন উহা যতটুকু সমাজের নিকট হইতে হইবে ততই শিশুর জ্ঞান দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রথম হইতেই সমাজের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সামাজিক কাজে শিশুকাল হইতেই কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে সমাজ সেবা দ্বারা নিজ জীবনকে ধন্য করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। আবার বিদ্যালয়কেও একটি সমাজ বলিয়া কল্পনা করা হয়—ইহা শিশু এবং শিক্ষকদের এক বিশেষ সমাজ। এই সমাজে বাস করিয়া ইহার দায়িত্বপালন করার ভিতর দিয়াই শিশু শিক্ষালাভ করে। কাজেই সামাজিক জীবনযাপন করাই শিক্ষার মাধ্যম।

(১) সমাজীকরণই শিক্ষা (Education is socialization)। সমাজের আইন-কানুন সুষ্ঠুভাবে পালন ও সামাজিক কার্যাবলী সুসম্পাদন করিবার জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করিয়া তোলাই শিক্ষার কাজ। (২) নাগরিক শিক্ষাদানই শিক্ষার উদ্দেশ্য (Education is the training for citizenship)। ছাত্রদিগকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করিয়া তুলিবার জন্যই বিদ্যালয় স্থাপিত। (৩) বর্তমান সমাজ অনেকটা বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে এবং অর্থোপার্জনই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া কোন কোন সমাজতন্ত্রবাদী বৃত্তিশিক্ষাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন (Education is the training for vocation)।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজতন্ত্রবাদীরা ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজকে উর্ধ্বে স্থান দেন। সমাজ-সেবায়ই ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা। ব্যক্তির অবদানে সমাজের পরিবর্তন হয়—ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাই শিক্ষা দ্বারা সমাজের পরিবর্তন সম্ভব—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। শিক্ষা দ্বারা সমাজের পরিবর্তন না হইয়া স্থায়িত্বই সাধিত হইবে। শিক্ষা সমাজের ধারক এবং বাহক। ইহা সামাজিক পারিপার্শ্বিকের অনুকূল হইবে। বিদ্যালয়কে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কখনই শিক্ষাদান সম্ভব নহে। অভিভাবক, পিতামাতা এবং সমাজের বয়স্ক লোকগণ বিদ্যালয়ের সংগে যত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিবেন ততই বিদ্যালয়ের আবহাওয়া অনুকূল হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও যথাসাধ্য সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিবেন; তাহাদের সমাজ-জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই তাহারা সামাজিক কর্মে নিযুক্ত থাকিবে। গ্রাম সাফাই, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, যেমন নবান্ন-উৎসব, পৌষপার্বন, শারদোৎসব ইত্যাদি পালনের মধ্য দিয়া এবং প্রদর্শনী করা, সেবাদল গঠন করা ইত্যাদি কর্মের মধ্য দিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগে সমাজের সংযোগ-স্থাপন সমীপতর হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলির কথা বলা যাইতে পারে। মোট কথা, বিদ্যালয় যে একটি সমাজ এবং এই সমাজের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া পরস্পরের ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আদান-প্রদানের দ্বারা শিশু যে শিক্ষালাভ করে, তাহাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদিগণ মনে করিয়া থাকেন।

সমাজতন্ত্রবাদের অবদান

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত, সমাজতন্ত্রবাদেরও শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি অবদান কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিক্ষা যে বর্তমানে বাস্তবতামুখী হইয়াছে এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় যে শিক্ষা-দানের চেষ্টা হইতেছে ইহা প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রবাদেরই প্রভাবের ফল। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন-গঠনের যে চেষ্টা চলিতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের উপরে যে জোর দেওয়া হইতেছে তাহা সমাজতন্ত্রবাদের প্রত্যক্ষ অবদান।

অপরদিকে মানুষ সমাজের হাতে কাদামাটির ঢেলার মত, ইহা স্বীকার করাও অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। মানুষ তাহার আদর্শ, চিন্তাধারা প্রভৃতিতে কখনই সমাজকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না, তাহাও বিশ্বাস করা কঠিন। সমাজ ভিন্ন মানুষের কোন পৃথক্ সত্তা নাই, ইহাও সহজে গ্রহণ করা যায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ঃ

শিক্ষার ব্যাপারে সকলে এক মতবাদ পোষণ করিবেন, ইহা আশা করাও যায় না অথবা বাঞ্ছনীয়ও নহে। একনায়কতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিমতকে তাঁহারা কঠোর হস্তে দমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতি নাগরিককে একইভাবে একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যাহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাহারা ব্যক্তিজীবন ও শিক্ষাব্যবস্থা উভয়তঃই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার পক্ষপাতী। বস্তুতঃ ঐ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ভিতর দিয়াই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু অপর পক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর মতদ্বৈধতাও চলে না। এক বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষকের উদ্দেশ্য যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা হইলে একের কার্যের প্রভাব অপরের কার্যে বাধা সৃষ্টি করে। এরূপক্ষেত্রে তাঁহারা ছাত্রদের মনেও নানারূপ দ্বিধা, অবিশ্বাস এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মোটামুটিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ উভয়েরই শিক্ষার দিকে বিশিষ্ট অবদান আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শিশু-মনস্তত্ত্বের দিকে আমাদের মন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই—শিশুমনের বিকাশপদ্ধতি শিক্ষার ভিত্তি। শিশুকে জানার জন্য নূতন নূতন পদ্ধতি ও গবেষণা হইতেছে। বর্তমানে শিশুকেই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশুর অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদিকে সর্বপ্রথম স্থান দিতে হইবে। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ ব্যতীত কোন শিক্ষাই তেমন সফল হইতে পারে না। প্রতি শিশুর বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতির বিভিন্নতা হিসাবে তাহার শিক্ষাপদ্ধতিও বিভিন্ন হইবে। সমষ্টিগত শিক্ষা যতদূর সম্ভব পরিবর্তিত করিয়া ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রতিটি শিশু যথাসাধ্য নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষক কোনমতেই শিশু-মনের উপর জোর করিবেন না।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদকে মোটামুটিভাবে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য হইয়া কোন শিক্ষাই সম্ভব নয়। শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিলাইয়া দিতে

হইবে। ছাত্রাবস্থা হইতেই শিশুকে সমাজের সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে এবং এইজন্য তাহাকে সাধ্যমত সামাজিক কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পকাজের সামাজিক মূল্য অনেকখানি। বৃত্তিশিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হইবে; কারণ ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনে ইহার দাবী সর্বাগ্রে। সামাজিক শিক্ষা অর্থাৎ সামাজিক রীতি-নীতি ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা এই বাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্র এই দুই বাদের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিয়া আমাদের এমন কোন সাধারণ সূত্রের কথা চিন্তা করা কর্তব্য—যাহার দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ নিজ নিজ বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এমনভাবে কাজ করিতে পারে—যাহার ফলে শিক্ষায় কোন পরস্পর-বিরোধী ব্যবহারের সৃষ্টি না হয়, অথচ উভয় মতবাদের বিশিষ্ট অবদানও রক্ষা পায়। ব্যক্তি যদিও সমাজ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত, তথাপি তাহার স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করা চলে না। ব্যক্তি যদিও সমাজের মধ্যে বাস করে এবং যদিও তাহাকে সমাজের অংশ বলা যাইতে পারে, তথাপি সমাজ হইতে তাহার নিজ বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সামাজিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও প্রত্যেক লোকের জীবনের নিজ উদ্দেশ্য বর্তমান। সমাজ তাহাকে প্রভাবান্বিত করিলেও তাহার জন্মগত গুণাবলী তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান করে; এইজন্য একই সমাজের বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বর্তমানে সমাজতন্ত্রবাদিগণ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই বিশিষ্ট অবদানকে সানন্দেই গ্রহণ করিয়াছে। শিশুর জন্মগত গুণাবলীকে সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মাঝে বিকাশসাধন করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

অপরদিকে সমাজকে ব্যক্তির সমষ্টি বলিলে ভুল বলা হইবে। সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিণতি বিদ্যমান। ব্যক্তিবিশেষ সমাজকে প্রভাবান্বিত করিলেও সমাজ সর্বদাই ব্যক্তিকে ছাড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা রাখে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশভঙ্গি আছে এবং এই বিকাশভঙ্গি দ্বারা সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিমাত্রেই প্রভাবান্বিত হয়। ব্যক্তিকে সামাজিক জ্ঞান, কৌশল ও রীতিনীতি মোটামুটিভাবে আয়ত্ত

করিতে হয়। সুতরাং উপযুক্তভাবে সামাজিক জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতে অনেকখানিই সমাজ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার নিজ বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশে সমাজের অনেকখানি অবদান আছে।

মূলতঃ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ও পরিণতি আছে। উভয়কেই আমাদের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই প্রধান বা অপ্রধান করা চলে না। উভয়ই পরস্পর নির্ভরশীল। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি ও একের অবনতিতে অপরের অবনতি। সুতরাং দেখা যায় যে, আদর্শ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। তবে যখন কোন একটি নিজ প্রয়োজনে প্রধান হইয়া ওঠে, তখনই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন দেশের শিল্প-বিপ্লবের জন্য কারিগরের প্রয়োজনে শিক্ষাব্যবস্থায় কারিগরী-শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। ইহা সমাজের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য খর্ব হওয়া স্বাভাবিক। এই দ্বন্দ্ব সাময়িক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের হাত ধরিয়া চলে। যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন আমরা নিম্নলিখিত নীতির সাহায্যে তাহার মীমাংসা করিতে পারি।

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরস্পরের বিকাশের জন্য অপরিহার্য; ফলে, কোন দ্বন্দ্বের সময়ে যাহার অস্তিত্বের উপর অধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা, তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়া দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যাইতে পারে। বক্তব্য পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ১। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে যখন সমাজের অস্তিত্বই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তখন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিয়াও সকলকে সৈনিক হইবার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ২। আবার কখনও যদি সমাজের অধিক সংখ্যক কারিগরের প্রয়োজন হয় (যেমন বর্তমানে আমাদের দেশে হইয়াছে), তাহা হইলে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া কারিগরি-শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিলে অন্যায় হইবে। এই আলোচনার মধ্য দিয়া অবশেষে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি—

সমাজের একজন সভ্যরূপে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (The aim of education is the highest development of the individual as the member of society)

অনুশীলনী

১। শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কি? এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া প্রয়োজন আলোচনা করুন।

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত?

৩। বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনের সংগে সংগে শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিবর্তন আলোচনা করুন।

৪। আদর্শবাদে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কি ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে?

৫। প্রকৃতবাদী ও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাবাদীদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?

৬। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৭। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কি ভাবে সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঠ্যক্রম

"There can be no doubt that children should be taught those useful things which are really necessary."

—*Aristotle.*

শিক্ষাদান-সম্পর্কে বহুবিধ মত থাকিলেও প্রত্যেক শিক্ষাদর্শনে জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যদিও জন্ম হইতেই প্রত্যেক অভিজ্ঞতার সহিত জ্ঞানার্জন ক্রিয়া চলিতে থাকে, তবু বিধিবদ্ধভাবে ইহার আরম্ভ হয় বিদ্যালয়ে। জ্ঞান অনন্ত। জগতে কত রকমের জ্ঞানলাভ করা যায় তাহার হিসাব কেহই রাখে না। কোথায় ইহার সুরু এবং কোথায় শেষ তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই সীমাহীন জ্ঞানসমুদ্র হইতে আমরা গণ্ডুষমাত্র গ্রহণে সমর্থ হই। বিদ্যালয় তাই পূর্ব হইতেই তাহার লক্ষ্য স্থির করিয়া রাখে; কোন্ জ্ঞান কত সময়ের মধ্যে অর্জন করিতে ছাত্রদের সাহায্য করা যাইতে পারে, পূর্বেই তাহা পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে এবং এই পরিকল্পনাই পাঠ্যক্রম। এক কথায় বলিতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিক্ষার ক্রম অনুসারে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সমষ্টিকেই পাঠ্যক্রম নামে অভিহিত করা যায়।

পাঠ্যক্রমের সংজ্ঞা-নির্দেশ

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম হইবে উহার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠের বিষয়বস্তুসমূহ।

কিন্তু আধুনিক মত অনুসারে পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র পাঠ্যতালিকা নহে। ইহার সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। শুধু অর্জনযোগ্য জ্ঞানের তালিকাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করাই যথেষ্ট নহে। কি কি কাজ বা কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঐ জ্ঞানগুলি আয়ত্ত করা যাইতে পারে তাহার ইঙ্গিতও পাঠ্যক্রমে থাকা আবশ্যক। ধরুন, ভূগোলের পাঠ্যক্রমে শুধু 'ভারতের রাজনৈতিক বিভাগ'— এই কথার উল্লেখ থাকাই যথেষ্ট নয়; এই জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে ম্যাপ আঁকারও প্রয়োজন; সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক বিভাগের ম্যাপ অঙ্কনও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আবার জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা ব্যতীতও মানুষের চারিত্রিক ও শারীরিক গুণের সম্ভাব্য বিকাশসাধন করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে যে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়, তাহার ইঙ্গিতও পাঠ্যক্রমে থাকা প্রয়োজনীয়। যেমন—ব্যায়াম বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সংক্ষেপে, পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ে অনুসৃত দিনপঞ্জীর একটি মোটামুটি ইঙ্গিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমূল পরিবর্তিত হওয়া দরকার। কিছুদিন পূর্বেও পাঠ্যক্রমের গণ্ডি এত অপরিসর ছিল যে, নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানদান ব্যতীত অন্য সব শিক্ষাই পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত ছিল। যেমন, খেলাধূলা বা অভিনয়াদি করা। ইহার জন্য পাঠ্যক্রমে কোন স্থান ছিল না। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থাও হইত না। বিদ্যালয়ের কর্মশেষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ ইহার ব্যবস্থা করিতেন। অথচ এইসব শিক্ষা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে ও জীবনের অন্যান্য দিকে সহায়তা করে। সেইজন্য বর্তমান যুগে এই শিক্ষাকে আর পাঠ্যক্রমের বহির্ভূত রাখা উচিত নয়। পাঠ্য-ক্রমের মধ্যেই ইহার স্থান দেওয়া প্রয়োজনীয়। আবার শিক্ষার ব্যাপকীকরণ (Transfer of Training) সম্বন্ধে বর্তমানে যে সব গবেষণা হইয়াছে, তাহা দ্বারা দেখা যায় যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠের বিষয়বস্তু হইতে পাঠদানপদ্ধতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞানের কার্যকারিতা অনেকখানি পাঠদান-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। তাই বিষয়বস্তুর সহিত শিক্ষাপদ্ধতিও পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিভাবে পড়ান হইবে, ছাত্রদের কি কি কাজ করিতে দেওয়া হইবে ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাঠ্যতালিকায় না থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

একদিকে পাঠ্যতালিকা, পাঠের বিষয়বস্তু, ইহার ক্রম, এবং শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপকতা যত সম্পূর্ণ (comprehensive) হয় ততই ভাল। অপরদিকে ইহা আবার যথেষ্ট সম্প্রসারণশীল (flexible) হওয়া প্রয়োজনীয়। পাঠ্যক্রমকে কোন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়কে কখনই কারখানার পর্যায়ে ফেলা চলে না। ক্রমবর্ধমান এবং বিবর্তনশীল মানব-জীবন ও মন লইয়াই বিদ্যালয়ের কাজ চলে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও তাই কোন নির্দিষ্ট ধাচে গঠন করা চলে না। প্রত্যেক শিশুই অন্য শিশু হইতে আলাদা। সুতরাং প্রতিটি শিশুকেই ভিন্ন ভিন্ন ধাচে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অতএব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমও সেই পর্যায়ে সম্প্রসারণশীল হইবে। পাঠ্যক্রম সর্বদাই শিশুর ধীশক্তিকে অনুসরণ করিবে—শিশু কখনই পাঠ্যক্রমের পিছনে ধাবিত হইবে না। পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিকে সুনির্ধারিত করা। এই শিক্ষাপদ্ধতি কখনই একই ধারায় গঠিত হইতে পারে না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া এই পাঠ্যক্রম গড়িয়া উঠিবে ; এমন কি অবস্থাবিশেষে একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেও পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে। ছাত্রদের মননশীলতা, ধীশক্তি প্রভৃতির পার্থক্যের উপরে পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা নির্ভরশীল। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক। একটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ—নির্দিষ্ট পথ (track) অনুসরণ করিয়া নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছাইলেই ঘোড়া থামিয়া পড়িবে। এই পথ (track) এবং সীমানা বা লক্ষ্য (target) দুইই অপরিবর্তনশীল। পাঠ্যক্রম এইরূপ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। অন্যদিকে ইহাকে সীমা হইতে অসীমের মধ্যে ধাবমান বলা যাইতে পারে। যেমন একটি বিড়াল কোন ইঁদুরের পিছনে ক্রমধাবমান। ইঁদুর প্রতিনিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণশীল। সংগে সংগে বিড়ালের পথ (track) এবং লক্ষ্যও (target) পরিবর্তনশীল। শিশুমন পাঠ্যক্রমকে অনুরূপভাবে অনুসরণ করিবে। ইহার জন্য একেবারে বাঁধাধরা কোন পথ বা সীমা নাই। শিশুমনের পরিবর্তন এবং পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন একই সঙ্গে চলিতে থাকিবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠ্যক্রমের স্বরূপ-সম্পর্কে আমাদের নিম্নলিখিত ধারণা হইবে ঃ

১। ইহা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যলাভ এবং দৈহিক ও মানসিক বিকাশসাধনের পথে চালিত করিবে।

২। ইহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের দিনপঞ্জীস্বরূপ ; পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ও সহ-অন্তর্ভুক্ত (curricular & co-curricular) বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পিত কার্যাবলীর স্থানও এই দিনপঞ্জীতে নির্দিষ্ট থাকিবে।

৩। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে কি কি কার্য করিবে এবং শিক্ষক এইজন্য কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এই সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকিবে।

৪। ইহাকে এমন প্রশস্তরূপে গঠন করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনবোধে ইহার প্রকৃত রূপকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা চলে। সংক্ষেপে পাঠ্যক্রমকে শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতির উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে।

পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন বহুবিধ। ইহা একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি শিক্ষকের পক্ষেও ; অপরদিকে সমাজের প্রয়োজনমত ইহার স্থান। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অপরিহার্য। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে পালন করিতে হইলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে কোন্ কোন্ বিষয় এবং কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সে কি কি কাজে লিপ্ত হইবে তাহা পূর্ব হইতেই মোটামুটিভাবে স্থির করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কোন সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসাধন করিতে হইলে প্রত্যেকের সামাজিক উদ্দেশ্য এক-হওয়া প্রয়োজনীয়। শিক্ষাব্যবস্থাতে সাদৃশ্য থাকিলেই প্রত্যেকের সামাজিক উদ্দেশ্য একমুখী হইতে পারে, কারণ শিক্ষাই মানুষের সামাজিক চেতনা জাগ্রত করে। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থাতে সাদৃশ্য রক্ষা করা একমাত্র পাঠ্যক্রমের সহায়তাতেই সম্ভব। তৃতীয়তঃ, পাঠ্যক্রম শিক্ষককেও নির্দেশ দেয়। কোন্ বিষয় কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে তাহা পাঠ্যক্রমের সাহায্যেই জানা সম্ভব। চতুর্থতঃ, পাঠ্যক্রম পরীক্ষা-পদ্ধতিকেও সাহায্য করে। পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করিয়াই পরীক্ষক জানিতে পারেন—বিদ্যালয়ে কতখানি কাজ হইয়াছে। এইভাবে পাঠ্যক্রম সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে সহায়তা করে।

যুগের পরিবর্তনের সংগে সংগে শিক্ষার উদ্দেশ্যের যেরূপ পরিবর্তন হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের পরিবর্তনের সংগেও পাঠ্যক্রমের সেইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের একটি ধারাবাহিক পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা দেখিতে পাই আত্মোপলব্ধিই ছিল তখন শিক্ষার লক্ষ্য। ঐক্যের পাঠ্যক্রম ছিল বেদাভ্যাস ব্রহ্মচর্যপালন, আত্মসংযম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্রকেই দিত প্রধান স্থান; সেজন্য পাঠ্যক্রমে যুদ্ধশিক্ষা, আইন-শিক্ষা, নাগরিকশিক্ষা প্রভৃতির স্থান ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শুধু পাদ্রী ও জমিদারদের জন্য। ধর্ম ও চরিত্রগঠনের শিক্ষাই ছিল পাঠ্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠ্যক্রমের বিবর্তন

ইহার পরে যে যুগ সেই যুগে বিজ্ঞানের প্রসারের সংগে সংগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপীই শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রায় একই হইয়া দাঁড়ায়—তাহা হইল অর্থকরী শিক্ষা।

শিক্ষাকে জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হইল। ইহাতে শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনের পরে যখন বাস্তব জীবনে প্রবেশ করিত, তখন জীবনের সংগে তাহার অর্জিত জ্ঞানের কোনও মিল সে খুঁজিয়া পাইত না। ফলে তাহার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইত না।

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে এক আলোড়ন দেখা দিল। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ পরিপূর্ণ-জীবনের প্রস্তুতিকেই শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিভিন্ন মতবাদে পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া এই আদর্শকে দৃঢ়তর করিলেন।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রকৃতিবাদীরা বলিলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থী বস্তুসম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথি ও কথার প্রাচুর্য অধিক। শুষ্ক মানসিক জ্ঞান ও সংবাদের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও কর্মের সাহায্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞানলাভ করিলে তাহা অধিকতর স্থায়ী ও কার্যকরী হয়। খেলাচ্ছলে শিশু শিক্ষাগ্রহণ করিবে। শিশুকে তাহার বিকাশ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দানই এই বাদে নির্দেশ দেয়।

এই প্রকৃতিবাদকে অবস্থা-অনুসারে ব্যবস্থাবাদের দ্বারা পরিমার্জিত রূপ দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা-অনুসারে ব্যবস্থাবাদে পাঠ্যক্রমের ব্যবহারিক রূপ পাওয়া যায়। পাঠ্যক্রম এমন হইবে যাহা শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করিবে। শিশুর বর্তমান জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই কেবলমাত্র নয়, তাহার

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠা-স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যও উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন।

শিক্ষাবিদ্ Aristotle বলিয়াছেন, "There can be no doubt that children should be taught those useful things which are really necessary."—অর্থাৎ শিশুর জীবনগঠনে প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই।

সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্দের বিভিন্ন মতবাদকে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর স্বভাব, দক্ষতা, আগ্রহ ও অনুভূতির বিকাশকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিয়া তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পাঠ্যক্রমে শিশুর জ্ঞান-সঞ্চয়ের ও দক্ষতা-অর্জনের স্থান থাকিবে। এই জ্ঞান শুধুমাত্র শিশু-জীবনের জন্যই অর্জন করিবে না, ভবিষ্যতে পরিণত মানুষ হইতেও এই জ্ঞান শিশুকে সাহায্য করিবে; শিশু নিজেও উন্নত হইবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সমাজকেও উন্নত করিবে।

পাঠ্যক্রমের এই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে শিক্ষাকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করিতে হইবে; এ ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের দান অপরিসীম। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও আগ্রহের উপরই শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনেই শিক্ষাদানের আরম্ভ এবং প্রয়োজনের নিবৃত্তিতেই ইহার সমাপ্তি হইবে। অধুনা অনেকেই বিশ্বাস করেন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকেন্দ্রিক ও আগ্রহকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। অধিকন্তু বর্তমানই শিশুর কাছে সত্য; ভবিষ্যৎ কল্পনা মাত্র। কাজেই প্রধানতঃ শিশুর বর্তমান প্রয়োজন এবং আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই পাঠ্যক্রম রচনা করিতে হইবে। সুতরাং শিশুর বর্তমান প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয়। শিশুর প্রয়োজন সাধারণতঃ দ্বিবিধ—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ব্যক্তিগত প্রয়োজন আবার কয়েকভাগে বিভক্ত। যেমন—(১) বুদ্ধিঘটিত বা মানসিক প্রয়োজন, (২) শারীরিক প্রয়োজন, (৩) আনুভূতিক প্রয়োজন ও (৪) আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রয়োজন। সামাজিক প্রয়োজনকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১। জীবিকার্জন বা অর্থনৈতিক প্রয়োজন, ২। সামাজিক দায়িত্ব-পালনের প্রয়োজন, ৩। নাগরিক কর্তব্য-পালনের প্রয়োজন।

বর্তমানে পাঠ্যক্রমকে বিষয়কেন্দ্রিক না করিয়া কর্মকেন্দ্রিক করিবার নীতি প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের নির্দেশ না থাকিয়া, শিশুর প্রয়োজনের নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মের ইঙ্গিত থাকিবে। বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ দ্বারা জ্ঞান-লাভ, পাঠ্যক্রমে নির্দেশিত বিভিন্ন কর্মের অন্তর্গত হইবে। আমেরিকায় ৩০টি বিদ্যালয়ে ঐরূপ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম লইয়া ৮ বৎসর একাদিক্রমে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে অনুসরণ করার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে (subjects) ছাত্রদের জ্ঞান, প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুসরণকারী ছাত্রদের অপেক্ষা অল্প হয় না। অধুনাতন পাঠ্যক্রম-রচনার পদ্ধতি হইল, একদিকে শিশুদের বিভিন্ন প্রয়োজনের তালিকা রাখা এবং অপরদিকে ঐ সব প্রয়োজনের নিবৃত্তির জন্য সুপরিকল্পিত নির্দিষ্ট কর্মের নির্দেশ দেওয়া।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পাঠ্যক্রম নির্ণয়কালে আমাদের কয়েকটি নীতিকে অনুসরণ করিতে হইবে। সেগুলি এইরূপ—

ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতার নীতি (Individual relevance)

পাঠ্যক্রম নির্ণয়কালে ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতার (individual relevance) নীতিকে সাধ্যমত স্থান দিতে হইবে। এতদিন শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার শিক্ষার্থীর উপর চাপাইয়া দিয়াই শিক্ষাদান-কার্য সমাপ্ত হইত। শিক্ষা বলিতে ইহাই বুঝাইত এবং শিক্ষার্থী এখানে ছিল সম্পূর্ণ গৌণ। শিক্ষক যাহা শিক্ষা দিতে চাহেন তাহাতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন আছে কিনা এবং তাহা তাহার ক্ষমতার মধ্যে কিনা—এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর ছিল। শিক্ষার্থীর পক্ষে যে সব জ্ঞানার্জন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠের মাধ্যমে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়াই পাঠ্যক্রম প্রণয়নের একমাত্র সমস্যা ছিল। সুতরাং পাঠ্যক্রম ছিল যুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া (logical), মনস্তত্ত্বকে নহে। কিন্তু অধুনা শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। দেখা যায় যে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীন প্রচেষ্টা ব্যতীত শিক্ষাদান সফল হইতে পারে না। অতএব পাঠ্যক্রম শিশুকেন্দ্রিক ও মনস্তত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়াই হওয়া উচিত। বস্তুতঃপক্ষে শিক্ষার্থীর বয়স, তাহার মানসিক পরিণতির স্তর, মানসিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য, এবং তাহার আগ্রহ ও গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য

রাখিয়া পাঠ্যক্রমে বিষয়বস্তু ও কর্মের নির্বাচন করিতে হইবে। বয়স অনুসারে প্রত্যেক শিশুরই আগ্রহ, ক্ষমতা ও প্রয়োজনে পার্থক্য থাকে। পাঠ্যতালিকা-নির্ণয়ের কালে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন অপেক্ষা তাহার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনের (needs) কথা অধিকতর বিবেচনা করিতে হইবে। পাঠ্যতালিকা এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে, ইহার প্রতিটি কার্য তাহার নিকট অর্থপূর্ণ মনে হয় এবং তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউই শিশুর আগ্রহকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন—

১। শিশু কথা বলিতে চায়।

২। সে নিজে কিছু তৈয়ারী করিতে চায়।

৩। সে আবিষ্কার করিতে চায়।

৪। সে আবেগ প্রকাশ করিতে চায়।

পাঠ্যতালিকার রচনাকালে উপরি-উক্ত আগ্রহগুলির কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। পাঠ্যক্রমে যে সমস্ত কাজের সুযোগ থাকিবে তাহা যেন শিশুর জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত ও উপযোগী হয়। ইহাতে তাহারা স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত শিক্ষালাভ করিবে।

আবার শুধুমাত্র শিশুর বর্তমান জীবনের কথা ভাবিলেও চলিবে না; পাঠ্যতালিকা-নির্ধারণের সময়ে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের কথাও বিশেষভাবে ভাবিতে হইবে। ভবিষ্যতে সে সমাজের দশজনের একজন হইয়া বিভিন্নরূপ সামাজিক কর্মে যুক্ত থাকিয়া জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে। কাজেই পাঠ্যক্রম-রচনাকালে সমাজের সংগে ব্যক্তির সম্পর্কের কথাও চিন্তা করিতে হইবে। ব্যক্তির সংগে সমাজের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তির উন্নতির সংগে যেরূপ সমাজের উন্নতি, আবার সমাজের অগ্রগতির সহিত সেইরূপ ব্যক্তিরও অগ্রগতি। এক কথায় বলিতে গেলে ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ এবং সমাজের জন্যই ব্যক্তির প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের জন্যই শিশুদের মধ্যে প্রয়োজন ও আগ্রহের তারতম্য দেখা যায় এবং তাহাদের শিক্ষাও সেই সমাজের ভাবধারার অনুরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য বিদ্যালয়ের জীবন ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজনীয়। সামাজিক জীবনের

সমাজ-প্রাসঙ্গিকতা নীতি (social relevance)

বিভিন্ন ক্রিয়াসমূহের সহিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়বস্তু ও ক্রিয়াসমূহের সুস্পষ্ট মিল রাখিতে হইবে। পাঠ্যক্রম-নির্বাচনকালে সমাজের প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও তৎসম্পর্কিত ক্রিয়াসমূহ নির্বাচন করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর নঈ তালিমের পাঠ্যক্রম আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই আমাদের সামাজিক জীবনধারার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাতে বিভিন্ন বিষয় ও কর্মের স্থান রাখা হইয়াছে। ইহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে, শিশুর বর্তমান জীবনের প্রয়োজন, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। এই তিন প্রকার প্রয়োজন একইরূপ পাঠ্যক্রমের ভিতর দিয়া সিদ্ধ হইতে পারে।

পাঠ্যক্রমে অবিভাজ্যতা-নীতি (Functional Relationship)

পাঠ্যক্রম-রচনাকালে আমাদের আরও একটা নীতিকে অনুসরণ করিতে হইবে। পাঠ্যক্রম হওয়া উচিত অবিভাজ্যতার নীতিতে। মানুষ বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সহায়তায় যে জ্ঞানার্জন করে, তাহাকে কোনরূপেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা চলে না। মানুষের মন সাধারণতঃ বাস্তবধর্মী এবং এই বাস্তবতার মধ্যেই তাহার বিভিন্ন গুণাবলী পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয় ও তাহার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে গড়িয়া তোলে। এই পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Personality as a whole) গড়িতে কোন এক বিষয়ের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়—সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই অবিভাজ্যভাবে প্রয়োজনীয়। একটি একটি ইটের সহায়তায় একটি ইমারত তৈয়ারী হয়; কিন্তু প্রত্যেক ইটের সহিতই ইমারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ; ইমারতকে ভাবিতে গেলে সমস্ত ইটগুলির সমষ্টিকেই ভাবিতে হইবে। সেইরূপই ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ভাষা, শিল্পকলা প্রভৃতির জ্ঞান মানুষের জীবনে একই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষার কথা বা জ্ঞানের কথা ভাবিতে গেলে ইতিহাস হইতে ভূগোল এবং ভূগোল হইতে ভাষা বা গণিত কিম্বা শিল্পকলাকে তফাৎ করা যায় না। এইজন্য শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সার অনুবন্ধ প্রণালী বা সমবায় প্রণালীতে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শিশুর মানসিক পরিণতি এতখানি হয় না যে প্রত্যেকটি বিষয়কে সে আলাদা করিয়া বুঝিতে পারিবে। বাস্তব জীবনের সংগে সংযুক্ত শিক্ষাই শিশু গ্রহণ করিতে পারে। এই জীবনধর্মী শিক্ষাই

তাহার কাছে সত্য ও সার্থক। এইজন্য পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়।

পাঠ্যক্রমের পরিবর্তনশীলতা (Flexibility)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনড় বা অপরিবর্তনশীল নয়। প্রয়োজনবোধে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের থাকা প্রয়োজনীয়। প্রকৃতপক্ষে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে, কখনও বা একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বৎসরে পাঠ্যক্রমের অল্পবিস্তর পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও পাঠ্যতালিকা অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং পাঠ্যক্রম উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ধারণা থাকা ঠিক নয়—ইহার নির্ধারণে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজনীয়।

পাঠ্যক্রমের কর্মকেন্দ্রিক নীতি

পাঠ্যতালিকা যে আহরণীয় জ্ঞানের তালিকামাত্র নয়, এই আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ইহা কর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। ছাত্রগণ আপন অভিজ্ঞতা বা কর্মের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করে; চরিত্রগঠন এবং কৌশল বা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মের স্থান আরও অধিক। সুতরাং বিদ্যালয়ের করণীয় বিভিন্ন কর্মের ইঙ্গিতও ইহাতে থাকা উচিত।

উপরি-উক্ত নীতিগুলিকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিয়া বিভিন্নরূপ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম-সম্বন্ধে আরও স্পষ্টতর ধারণা লাভের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিক করিতে হইলে শিশুমন-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে :—

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতা নীতি

(১) সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণের মন কল্পনাপ্রবণ থাকে। এই-কল্পনা-প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করার মধ্য দিয়াই শিশুর মন নূতন নূতন জ্ঞান ও অনুভূতির অধিকারী হয়। এই সময়ে পাঠ্যক্রমে শিশুর কল্পনা-প্রবৃত্তির যথেষ্ট সুযোগ থাকা আবশ্যক। (২) ঔৎসুক্য প্রাণের লক্ষণ। শিশুমন ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ থাকে এবং তাহার শিক্ষা ব্যবস্থাতে জ্ঞানপিপাসার যথার্থ নিবৃত্তির দ্বারা এই ঔৎসুক্যকে বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা প্রয়োজনীয়। এজন্য

তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগা সম্ভব, সাধ্যানুযায়ী তাহার স্থান পাঠ্যক্রমে থাকিবে।

(৩) শিশু এই সময়ে বিশেষ কর্মপ্রবণ থাকে। কর্মেই তাহার আনন্দ। সুতরাং পাঠ্যক্রমে তাহার জন্য যথেষ্ট কর্মের সুযোগ থাকা প্রয়োজনীয়।

সমাজ-প্রাসঙ্গিকতা নীতি

সমাজের দিক্ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান। প্রথমতঃ, প্রাথমিক শিক্ষার শেষে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী সমাজ জীবনে প্রবেশ করিবে। এইজন্য মোটামুটিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাজ-জীবনের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তোলা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে সমস্ত শিক্ষার্থী উচ্চতর শিক্ষালাভের নিমিত্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়। তৃতীয়তঃ, শিশুচরিত্রের ভিত্তি এই সময়েই গঠন করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজনকে পৃথক্ করিয়া বিচার করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই দ্বিবিধ প্রয়োজনকে সামগ্রিকরূপে বিচার করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করিতে গেলে দেখা যায় যে, পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক।

(১) যদি আমরা বর্তমান সমাজে বসবাস করিতে চাই, তাহা হইলে অপরের অন্তরের ভাবগ্রহণের জন্য পঠন ও নিজ মনের ভাব প্রকাশের জন্য লিখন শিক্ষা করিতে হয়। পঠন ও লিখনের মধ্য দিয়া শিশুমনের কল্পনা ও ঔৎসুক্যের অনেকখানি নিবৃত্তি হইতে পারে।

পারস্পরিক সৌহার্দ ও মিলনের বাহন ভাষা ও সাহিত্য। কাজেই শিশুর লিখন-পঠন ও ভাষা আয়ত্তীকরণ-ব্যবস্থা সুকৌশলে সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য, যাহাতে সে ক্রমে সাহিত্য-রস-গ্রহণে ও বৃহত্তর মানব জীবনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

(২) সমাজ-জীবনের সাধারণ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে মোটামুটিভাবে গণিতের জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয় এবং ইহার ভিতর দিয়াও শিশুমনের স্বাভাবিক কৌতূহল অনেকখানি নিবৃত্ত হয়। গণিতের সাহায্যে নানারূপ প্রত্যক্ষ সমস্যার সমাধান করিয়া তাহারা কর্মের আনন্দ পাইয়া থাকে।

(৩) সমাজের প্রকৃত নাগরিক হইতে হইলে সমাজ-জীবনের মোটামুটি ইতিহাস জানা ও তাহাতে গৌরববোধ থাকা প্রয়োজনীয়। ইতিহাস মানব-জীবনের জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করে। বর্তমান ও অতীতের অচ্ছেদ্য-সম্পর্কের জ্ঞান ইতিহাসই দিয়া থাকে। এইজন্য জাতীয় ইতিহাসকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হইবে। ইতিহাস-পাঠের ভিতর দিয়া শিশুর কল্পনা-প্রবৃত্তিও অনেকখানি নিবৃত্ত হইতে পারে।

(৪) সমাজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও শিশুকে কিছু জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক। নিজের গৃহের পরেই শিশু তাহার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিককে জানিতে চায়। তাহাদের এই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ভূগোল ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে থাকা উচিত। ইহা ব্যতীতও এই দুইটি বিষয় মানুষে মানুষে এবং প্রকৃতি মানুষে সম্বন্ধ নিবিড় করিয়া তোলে। আশে পাশের মানুষকে জানার ও তাহাদের আচার-ব্যবহার, ভাবধারা, কৃষ্টি, সভ্যতাকে জানার মধ্য দিয়াই পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ জাগ্রত হয় ও মানবতার বিকাশ হয়।

(৫) সমাজে বাস করিতে হইলে নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকারের সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। এইজন্য সমাজ-পরিচালন যন্ত্রের সহিত শিশুকে মোটামুটি পরিচয় করাইতে হইবে। ইহারাই একদা নাগরিকরূপে পরিচয় দিবে—শৈশবেই ইহার গোড়া-পত্তন হওয়া উচিত। কাজেই পৌরবিজ্ঞান-বিষয়ক ও রাষ্ট্র-বিষয়ক জ্ঞান দিবার জন্য পাঠ্যক্রমে ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যেমন—সাফাই বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৬) সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনের স্থানও পাঠ্যক্রমে থাকিবে। ইহার মধ্য দিয়াই মানুষ তাহার আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়া মানসিক সাম্য ও শান্তি রক্ষা করে। শিশুর কল্পনাপ্রবণ মন ইহার পক্ষ আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভের সুযোগ পায়; শিশুমনে সহজ সৌন্দর্যবোধ জাগে। সমাজের কৃষ্টি, সভ্যতা ও গৌরব ইহাকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া ওঠে। সামাজিক উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও ইহার স্থান সর্বাগ্রে।

(৭) দৈহিক ও মানসিক সুস্থ ও সবল মানুষ গড়িতে হইলে স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শরীর-চর্চা শিক্ষারও প্রয়োজন থাকে। জাতির সম্পদ শিশু। সুতরাং তাহাদের নিজেদের এবং সংগে সংগে পারিপার্শ্বিককে সুস্থ ও পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত

সাফাই ও স্বাস্থ্যবিদ্যার স্থান রাখা কর্তব্য। দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা-বিধান এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দকে বজায় রাখিবার জন্য শরীর-চর্চা ও খেলার স্থানও থাকিবে।

উপরি-উক্ত পাঠ্যক্রম সমস্তটাই কর্মের উপর ভিত্তি করিয়া হইবে। শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই যথাসম্ভব তাহার শিক্ষার গোড়াপত্তন করিতে হইবে। আবার শিশুর স্বাভাবিক কর্মচঞ্চলতাকে ব্যাহত করিয়া শিক্ষাদান করিতে গেলে তাহা সার্থক ও সুন্দর না হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কর্মের (Activity) বিশেষ স্থান থাকিবে। শিশু-জীবনের ভিত্তিতেই কর্মের পরিকল্পনা করিতে হইবে এবং কর্মগুলি সৃষ্টিমূলক করিতে হইবে। শিশুর জীবনের সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়াই তাহার সৃষ্টিমূলক ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই কিছু না কিছু সৃষ্টি-ক্ষমতা থাকে। এই সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমেই তাহার সেই সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

এই সৃষ্টি-ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ পাইলে শিশুর কৌতূহল ও স্পৃহা এইদিকেই আকৃষ্ট হইবে এবং অবকাশ-সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার করিতে পারিবে। অনেক সময়ে দেখা যায় কোন দুরন্ত শিশু, জিনিসপত্র নষ্ট করা কিংবা পাগলামী করাই যাহার স্বভাব, তাহাকে এইরূপ কোন সৃষ্টিমূলক কাজের সুযোগ দিলে তাহার সমস্ত দুরন্তপনার অবসান ঘটাইয়া সৃষ্টির কর্মে মগ্ন করিয়া তোলে। যে শিশুর মধ্যে বিশেষ কোন গুণ থাকে সে সেই গুণের বিকাশের সুযোগ পাইলে ভবিষ্যতে হয়তো একজন দক্ষ কারিগর হইতে পারে এবং নিজ জীবিকার সংস্থান করিতে পারে। খাওয়া, পরা ও থাকা—মানুষ জীবনের সর্বপ্রথম এই তিনটি চাহিদার সংস্থান এই সৃষ্টি-ক্ষমতার সহায়তাতেই হইতে পারে। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষাকে সাধারণতঃ বিশেষ কোন শিল্পকেন্দ্রিক করা হইয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

একই নীতির প্রয়োগ করিয়া আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমও নির্ধারণ করিতে পারি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাংশ ছাত্র পাঠ-সমাপনান্তে সরাসরি সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে। তাহাদের তদনুরূপ জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চেষ্টা করাই মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে। অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিয়া যাহারা সমাজ-জীবনে

প্রবেশ করিবে, তাহাদের জীবন যাপনের মান বা স্তর ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ-শেষে যাহারা সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে তাহাদের জীবন-যাপনের মান বা স্তর সমগোত্রীয় না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং জীবনের মান অনুসারে ইহাদের শিক্ষা পরিকল্পনাও ভিন্ন হইবে। অপরদিকে কতকাংশ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণে থাকে। এই সময়ে তাহাদের বুদ্ধিশক্তি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং যুক্তিদ্বারাই তাহারা সংসারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে তাহারা আদর্শবাদী হইয়া ওঠে এবং কোন বিশিষ্ট আদর্শকে গ্রহণ করিয়া জীবন-যাপন করিতে চায়। আবার মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের দিকে তাহাদের বিশেষ ক্ষমতাগুলির বিকাশ পাইতে থাকে; কাজেই পাঠ্যক্রমে বহুবিধত্বের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আত্মনির্ভরশীল হইবার আকাঙ্ক্ষাও এই সময়ে তাহাদের মনে বিশেষভাবে জাগরিত হয়। ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধে তাহারা চিন্তা আরম্ভ করে। এই সময়ে ছাত্রছাত্রীদের যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং ইহা তাহাদের জীবনে বিশেষ সমস্যারূপে দেখা দেয়।

ব্যক্তি-প্রাসঙ্গিকতা

(১) সমাজের অধিকাংশ দক্ষতার কাজ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই করিয়া থাকে। এক হিসাবে ইহারাই সমাজের মেরুদণ্ড। বর্তমান সমাজে বিভিন্ন ধরণের উপজীবিকার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার জন্য বিভিন্নরূপ শিক্ষার ও চরিত্রের দৃঢ়তার প্রয়োজন। বিশেষ বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় বিভিন্নরূপ নিপুণ কারিগরের প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষার ভিতর দিয়াই তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা

(২) সমাজ-জীবনে আদর্শবাদ ও রীতিনীতি বর্তমানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পরিবর্তিত সমাজে নূতন চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়াই সমাজকে তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা-সমাপনান্তে ছাত্রগণ যাহাতে আপন আপন ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করিতে পারে, মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া সেই চেষ্টাও

করিতে হইবে। উপযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাজ হইতে বেকার-সমস্যা দূর করিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম

প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ও সমাজগত—এই দুই দিকের সামঞ্জস্য-বিধানপূর্বক নিম্নলিখিতভাবে পাঠ্যক্রম নির্ণয় করা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও গুণাবলীর বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত।

(খ) ইহার পর হইতে।

প্রথমোক্ত সময়ে সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলিবে, কিন্তু ক্রিয়া বা কর্মের মান অপেক্ষাকৃত উচ্চতর হইবে এবং কল্পনা-বৃত্তির অনুশীলন অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে অধিকতর জোর দিতে হইবে।

সুতরাং পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, সাহিত্য, রচনা, গণিত, ভূগোল, সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকিবে এবং বিষয়গুলির ধারাবাহিক জ্ঞান দিতে হইবে। অন্যদিকে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, ধর্ম ইত্যাদির স্থানও থাকিবে।

ব্যাপক বিদ্যালয়

বিশেষ বৃত্তিগুলি বিকাশের পরে মাধ্যমিক শিক্ষার ধারা স্বতন্ত্র হইবে। এই সময়ে বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ বৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যতালিকা নির্বাচন করিতে হইবে। নিজ নিজ বিশেষ ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি অনুসারে ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পাঠের ফলে পাঠশেষে তাহারা যেন নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমাজ ও ব্যক্তি উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। তাই এই সময়ে পাঠ্যক্রম বিভিন্নমুখী হইবে। এইরূপ বিদ্যালয়কে 'বহুভুজ' বা 'ব্যাপক' বিদ্যালয় (Multilateral School) বলা হইয়া থাকে; নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

(১) ইহাতে কলা বিভাগ থাকিবে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মানব-সমাজের সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হইবে। কলা বিভাগের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া এই বিষয়গুলির সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবে এবং সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহারা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, প্রভৃতির বৃত্তি গ্রহণ করিবে।

(২) বিজ্ঞান বিভাগ—এখানে ছাত্রগণ বিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান-লাভ করিবে এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া তুলিবে। পরে ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া উচ্চতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার জ্ঞানলাভ করিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বিজ্ঞানকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে। যেমন রাসায়নিক, ভূতাত্ত্বিক, জীবতাত্ত্বিক ইত্যাদি।

(৩) কারিগরি বিভাগ—ইহারা বিশেষ কোন কারিগরি শিক্ষা করিবে এবং তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কারখানা প্রভৃতির মাধ্যমে উহারা ঐ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবে। যে ছাত্র যে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করিবে তাহাই সে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবে। যেমন ফিটার, ফোর-ম্যান প্রভৃতির কাজ।

(৪) বাণিজ্যিক বিভাগ—এই শাখায় হিসাব-রক্ষণ ও গণনা-শিক্ষা ব্যবসায়িক রীতিনীতি ও পত্রালাপ ও সংগঠন, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কিন্তু আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সময়ে শিক্ষা কোন বিশেষ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক হইলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কারিগর সৃষ্টি করা বা জীবিকা সংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া নহে। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য থাকিবে। সুতরাং বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার সংগে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি ও পাঠ্যক্রমে থাকিবে। এতদ্‌ব্যতীত যাহাতে ছাত্রদের মনে সুষ্ঠুভাবে আদর্শবাদ গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার জন্য নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। ছাত্রদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত মোটামুটিভাবে যৌন শিক্ষা দিবার কথাও অনেকে সমর্থন করেন।

বৃত্তিমূলক ও আত্মোন্নতিমূলক পাঠ্যক্রম
(Vocational & Liberal Curriculum)

পাঠ্যক্রম-গঠনের সময়ে কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে বৃত্তিমূলক কিংবা আত্মোন্নতিমূলক—কোন্ বিষয়ের প্রাধান্য থাকিবে তাহা এইরূপ সমস্যার একটি। শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রাচীনকালে বৃত্তিমূলক বিষয়ের প্রাধান্য কখনও পাঠ্যতালিকায় ছিল না। আত্মোপলব্ধি, মানসিক আনন্দ, ভগবানের কৃপালাভ প্রভৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য

ছিল এবং পাঠ্যক্রমে ঐসকল উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইত। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদাভ্যাস করা শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য ছিল। প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার্থীর মনের স্ফূর্তি ও আনন্দের প্রকাশের জন্য 'সঙ্গীত'-("Music") শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র পাঠ্যতালিকার মূল বিষয়বস্তু ছিল। আবার বর্তমান যুগের প্রারম্ভে 'হিউম্যানিষ্ট' শিক্ষা ব্যবস্থায় মনের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য ল্যাটিন, ও গ্রীক্ সাহিত্যের পাঠ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে যে সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের অধিক সম্বন্ধ ছিল না।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বৃত্তির প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণ করিতে না পারিলে জীবন-তরণীকে সচল রাখিবার উপায় থাকে না। মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মই প্রায় উপযুক্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করে। একদিকে জীবনে বৃত্তির গুরুত্ব যত বাড়িয়াছে, অপর দিকে তাহা সংগ্রহ করা তত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বৃত্তির জটিলতাও অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের ন্যায় পিতার বৃত্তি সন্তান আর গ্রহণ করে না এবং শিক্ষানবীশি করিয়া বৃত্তি শিক্ষাও সম্ভব হয় না। পূর্বের মত বর্তমানে শিক্ষা কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই; জনসাধারণও শিক্ষার সুযোগ চায়। ফলে শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক করার দাবী উঠিয়াছে। অনেকেই মনে করেন—ছাত্রকে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার বৃত্তিমূলক শিক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজন অধিক। এই উদ্দেশ্যে বহুমুখী বা বহুভুজ বিদ্যালয় (multilateral), শিল্পমুখী বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাকে ব্যাপকতর রূপে বৃত্তিমূলক করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এমনকি যে সব বিষয় ভবিষ্যৎ বৃত্তিগ্রহণে সহায়তা করিবে সেইগুলিকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিবার অধিক ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

ফলে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যতালিকায় অনেকটা অবান্তর বোধ হইতেছে এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উপর অধিকতর ঝোঁক পড়িয়াছে। যত শীঘ্র সম্ভব ছাত্রদিগকে "সাধারণ" বিষয়গুলির পড়া বন্ধ রাখিয়া বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার মনোবৃত্তি দেখা যাইতেছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাতে ছাত্রের ভবিষ্যৎ বৃত্তির সুযোগ রাখিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, উপযুক্ত বৃত্তিলাভ

না করিতে পারিলে ছাত্রের শিক্ষা কার্যকরী হয় না। শিক্ষিত বেকারগণ সমাজ-জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই বেকার-সমস্যার দূরীকরণের জন্য পাঠ্যতালিকা কিছুটা বৃত্তি-অভিমুখী হওয়া প্রয়োজনীয়।

তবে একথাও সত্য যে বৃত্তিশিক্ষাদানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মানুষ অর্থোপার্জনের যন্ত্র-বিশেষ নহে। অর্থোপার্জন দ্বারাই জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের নিবৃত্তি হইতে পারে না। পরন্তু অর্থোপার্জন বা বৃত্তিলাভ মনুষ্যজীবনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নহে, উহা পরোক্ষ লক্ষ্যমাত্র। যাহার প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ ঘটে না, সে যদি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, তাহা হইলে তাহার চারিত্রিক অবনতি এবং মানসিক নানারূপ সমস্যার সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সমাজ-জীবনেও অর্থোপার্জন তাহার অনেক কর্মের মধ্যে একটি-মাত্র কর্ম। শুধু অর্থোপার্জন দ্বারাই সে সমাজের প্রতি তাহার কর্তব্য শেষ করিতে পারে না। যে যে দেশে সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তি ও অর্থোপার্জনকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেইসব সমাজে নানারূপ কুফল দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্ব-অর্জনের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

সুতরাং বৃত্তি-শিক্ষাদান বা ভবিষ্যৎ বৃত্তির গোড়াপত্তন করাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ছাত্রদিগের সাধারণ জ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন না করিয়া, তাহাদের মনের প্রসারতা-সাধনের সম্যক সুযোগ না দিয়া, এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করিবার পূর্বে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শারীরিক ও মানসিক দিকে বৃত্তি শিক্ষার উপযুক্ত হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জীবনে প্রবেশ করিলে তাহারা যে সমস্ত বৃত্তি গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। শিক্ষানবীশির দ্বারাই ঐ সব বৃত্তিতে দক্ষতা লাভ করা চলে। কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যতালিকায় এমন বিষয় থাকিবে যাহা দ্বারা আত্মোন্নতি, চরিত্র-গঠন ও সমাজ-জীবন-যাপনের উপযোগী জ্ঞান লাভ হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নয়। এই শিক্ষার পিছনে ছাত্রের জীবিকার্জনের প্রশ্ন বা উদ্দেশ্য থাকে

না, ছাত্রের শারীরিক, মানসিক ও অন্যান্য অন্তর্নিহিত গুণাবলার বিকাশ-সাধনের মাধ্যম হিসাবেই ইহাকে গ্রহণ করা হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণে পৌঁছে। এই বয়সে তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। বয়স্কদের মত তাহাদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীল হইবার আকাজ্ক্ষা জাগে। ফলে ভবিষ্যৎ বৃত্তি-বিষয়ে তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অপর দিকে এই বয়সেই ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিশেষ ক্ষমতার (special abilities) উন্মেষ হইতে থাকে। ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা নির্ণয়ের সময়ে ছাত্রদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ক্ষমতার তারতম্য এবং ভবিষ্যৎ বৃত্তির কথা চিন্তা করিতে হইবে এবং পাঠ্যতালিকায় অনুরূপ বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিকেন্দ্রিক করিলে চলিবে না। ছাত্রের সাধারণ জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম হইতেই বৃত্তির কথা ভাবিলে ছাত্রদের সাধারণ-জ্ঞানের ভিত্তি সুগঠিত হইবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষের দিকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ের স্থান পাঠ্যতালিকায় রাখা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতিরও স্থান রাখিতে হইবে। কারিগরি বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্পূর্ণ বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়েও 'সাধারণ' বিষয়ের যথেষ্ট স্থান দিতে হইবে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি পাঠ্যতালিকার অংশবিশেষ হইবে মাত্র এবং তাহাও এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে ছাত্রদের দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া না পড়ে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে পাঠ্যতালিকা কর্মকেন্দ্রিক হইবে। ইহাতে বিষয় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন তারতম্য থাকিবে না। ছাত্র আপন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানে উপস্থিত হইবে। পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষাদান-কার্যের কেন্দ্রে থাকিবে ছাত্রের প্রয়োজন। ছাত্র আপন প্রয়োজনের প্রেরণায় শিক্ষক, পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিকের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবে এবং ঐ সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সে নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে ও নির্দিষ্ট কৌশল আয়ত্ত করিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ছাত্রের অভিজ্ঞতা কতখানি শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশিত হইবে, এবং কতখানি সে নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছা ও প্রবণতা অনুসারে কাজ করিয়া সংগ্রহ করিবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে; ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই এ সম্বন্ধে অবহিত থাকিবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করিবার জন্য বিদ্যালয়ের পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহার পাঠ্যক্রম, সময়-তালিকা, পুস্তকাগারে নির্দিষ্ট পুস্তক, নির্দিষ্ট উৎসবাদি পালন ইত্যাদি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের পার্থক্য হেতু বিদ্যালয়-পরিচালনার ঐ সমস্ত কাজগুলিও বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। কাজেই বিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি পূর্বপরিকল্পিত হইবে, উহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নির্দেশ উপর হইতে না আসিয়া বিদ্যালয়রূপ সমাজের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে মিলিয়া গণতান্ত্রিক প্রথায় কর্মপদ্ধতি স্থির করিবে। অবশ্য শিক্ষকের বিদ্যা, বয়স ও অভিজ্ঞতা অধিকতর বলিয়া তিনি এই ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী নেতা না হইয়া গণতান্ত্রিক নেতা হইবেন। যে বিদ্যালয়ে পরিকল্পনা যত সুস্পষ্ট তাহা তত কার্যকরী হয়। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার স্থান অতি উচ্চে। এই হিসাবে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হইলেও তাহার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট সুযোগ থাকা উচিত এবং প্রয়োজন-বোধে নির্দেশিত কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনীয় ও পরিবর্ধনীয় হইবে।

নির্দেশিত ও অনির্দেশিত কাজ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকার প্রয়োগে সফলতা লাভ করিতে হইলে বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিশেষ সুযোগের প্রয়োজন। সব রকমের কর্ম যে কোন পারিপার্শ্বিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা চলে না। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কর্মে লিপ্ত হইবার উপযুক্ত সুযোগ ছাত্রদিগকে দিতে হইবে। সাধারণভাবে তাহাদের কতকগুলি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে পারি।

১। শিল্পকাজ—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্প শিশুকে হাতে-কলমে কাজ করিবার সুযোগ দেয় এবং প্রত্যেক শিশুই হাতে-কলমে কাজ করায় বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করায় বিশেষ আনন্দ লাভ করে। শিল্পের ভিতর দিয়া শিশুরা বিশেষভাবে তাহাদের কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তির বিকাশ করিতে পারে। তাহারা তাহাদের

নিজেদের সৃষ্টি দেখিয়া আত্মপ্রসাদও লাভ করে। বিশেষতঃ শিল্প কাজ করিতে করিতে তাহারা যে সব জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করে ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়, উহা শিক্ষার উদ্দেশ্য-সাধনে বিশেষ সহায়তা করে।

২। ক্রীড়া—যাহারা শিশুর মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী তাহারা জানেন যে ক্রীড়া শিশুর স্বাভাবিক কর্মের অন্যতম। ক্রীড়ার মাধ্যমে তাহারা নানারূপ জ্ঞান অর্জন ও কৌশল আয়ত্ত করে চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়।

এই উদ্দেশ্য সাধনে এবং শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে বিদ্যালয়ে এরূপ ক্রীড়ার প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ক্রীড়াগুলি ব্যক্তিগত ও দলগত উভয়ই হইতে পারে। ব্যক্তিগত ক্রীড়া প্রথম বয়সের উপযোগী। একটু বড় হইলেই ছেলেমেয়েরা দলগত খেলাতে আনন্দ পায় বেশী।

নাটক—অপরের অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব করিয়া উপলব্ধি করিতে নাটক সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করে। পুস্তকের জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ করিতে হইলে নাটক যথার্থরূপে কার্যকরী। পাঠদানকালে পাঠ্যবস্তুর নাটকীয় সম্ভাবনার সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে। পাঠ্যবিষয়ে অনুরাগ জন্মাইতেও নাটকের জুড়ী মেলা ভার। নাটক, কল্পনামূলক খেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলা। এই খেলা শিশুমনের বিশেষ উপযোগী। চরিত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে নাটক বিশেষ ফলপ্রদ। নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র শিশুমনে এক গভীর ছাপ ফেলে। সুতরাং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে অভিনয় মঞ্চ এবং ইহার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

চিত্রাঙ্কন ও হাতের কাজ—ইহাও কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের অঙ্গ। শিক্ষার্থী নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে চিত্রে বা মডেলে রূপদান করিতে পারিলে সেই জ্ঞান তাহাদের প্রত্যক্ষভূত হয়। ইহার সাহায্যে তাহাদের মনের ভাবগুলির অভিব্যক্তির সুযোগ পায়। সৃষ্টিমূলক কাজের মধ্যে ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশে ইহা বিশেষ সাহায্য করে। ইহা সৌন্দর্যানুভূতিরও বিশেষ মাধ্যম।

যাদুঘর—কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যাদুঘর থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র ও শিক্ষকের কার্যের দ্বারাই ইহা অনেকটা গঠিত হইতে পারে। ছাত্রদের বিভিন্ন শিল্পকাজের নিদর্শন ছাড়াও তাহাদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার নিদর্শন-গুলিও এখানে রক্ষিত হইতে পারে এবং পাঠদানকালে এই বিভিন্ন বস্তুগুলি অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করিতে পারে।

সঙ্গীত—অভিজ্ঞতাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে সুর ও ধ্বনি বিশেষ সহায়তা করে। সঙ্গীত ছাত্রদের রস-রুচি ও ছন্দোবোধ জাগরিত করে ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। শিশুদের অপার্থিব আনন্দদানে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত অপরিহার্য হইয়া ওঠে।

পুস্তকাগার—কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষাকে সমর্থন করে না। কিন্তু ছাত্রের নিজ পাঠের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নিজ পাঠের অভ্যাস শিশুমনে জ্ঞান, স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রৎ করে। নিজেদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে পুস্তকের ভাষায় প্রকাশিত দেখিলে তাহাদের জ্ঞানার্জনের আনন্দ পূর্ণ হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে তাহাদের নিজস্ব হয়। সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থাগারের সাহায্যে ছাত্রদের নিজ পাঠে আগ্রহ জন্মান প্রয়োজনীয়।

কৃষি—ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। নিতান্ত নগরী ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই ছাত্রদের কৃষি-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। আর কিছু না হউক ফুল বা শাকসব্জির বাগান অনেকেই করিয়া থাকে। কৃষিতে আমাদের দেশের ছাত্রদের অনুরাগ স্বাভাবিক। কৃষি করিতে গিয়া তাহারা ক্রমবর্ধমান প্রাণের সংস্পর্শে আসে ; প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণে তাহারা বীজ হইতে অংকুর, অংকুরের পত্রোদ্গমে ও শিশুবৃক্ষে পরিণতি এবং এইভাবে প্রাণের প্রকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করে, মন দিয়া অনুভব করে এবং জীবন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সুতরাং ছাত্রদের নিকট কৃষিকার্যের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অনস্বীকার্য।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের জন্য অধিক স্থানের একান্ত প্রয়োজন। খেলার মাঠ, মুক্ত স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্র, সব কিছুর জন্যই প্রচুর উন্মুক্ত স্থানের প্রয়োজন। ঐ সব স্থানের উপযুক্ত রক্ষা ও ব্যবহারের জন্য জলসিঞ্চনের প্রয়োজন। বিদ্যালয় গৃহেও পুস্তকাগার, যাদুঘর, শিল্পকাজ, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, প্রার্থনা বা উৎসবাদির জন্য বিভিন্ন গৃহের বা শ্রেণীর প্রয়োজন।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের কার্যগুলি কতটুকু নির্দেশিত হইবে, বা কতটুকু ছাত্রদের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিবে, তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণে ছাত্রদের সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়। অনেক সময়ে প্রধান শিল্পের সহিত বিদ্যালয়ের কর্মকে অধিকতরভাবে জড়িত করার নিমিত্ত কর্মের সৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ

ছাত্রদের 'চরখার গান' শিক্ষা দেওয়া এবং তকলীর চিত্র অঙ্কন করিতে দিবার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্মগুলি যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হইলে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের মূলনীতিকে ধ্বংস করা হয়। যেমন ছাত্রদিগকে কোন নক্সাবিহীন একই প্রকার কাপড় দিনের পর দিন বুনিতে বলা হইলে তাহাদের আগ্রহ নষ্ট হইয়া যায়। মোটামুটিভাবে ছাত্রগণ কোন্ ধরণের, কি কাজ করিবে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে তাহার নির্দেশই শুধু থাকিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক নিয়ন্ত্রণ শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকরই হইবে। কে কোন্ শিল্পে অংশ গ্রহণ করিবে, কে কোন্ চিত্র অঙ্কন করিবে, কিংবা অন্যান্য কর্মে কে কোন্ অংশ গ্রহণ করিবে তাহা অধিকাংশই ছাত্রদের ইচ্ছা, ক্ষমতা ও প্রবণতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। স্থতরাং প্রতি কার্য্যে কতখানি নির্দেশিত থাকিবে এবং কতখানি অনির্দেশিত হইবে তাহা বিদ্যালয়ের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এবং প্রধানতঃ ছাত্রদের প্রবণতা ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করা প্রয়োজন।

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে সামাজিক উৎসব

প্রত্যেক কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ই কতকগুলি সামাজিক উৎসব শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করে। প্রত্যেকটির নাম করা যাইতে পারে যেমন, পুরস্কার-বিতরণ, বাৎসরিক দিবস, মাতা-পিতা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, গান্ধীজয়ন্তী, নবান্নোৎসব, পৌষপার্বন, শারদীয়োৎসব, বসন্তোৎসব, বৃক্ষরোপণোৎসব ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের সমাজজীবনের পক্ষে এই উৎসবগুলির বিশেষ মূল্য আছে। বিভিন্ন উৎসবের অনুষ্ঠান ছাত্রদের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনে সার্থক হয়। উৎসবের মধ্যে পরস্পরের অন্তরঙ্গ মেলামেশা এবং একই সংগে একই উদ্দেশ্যকে সফল করার প্রচেষ্টা তাহাদের সামাজিক সম্বন্ধকে দৃঢ়তর করে। অভিজ্ঞ শিক্ষক বুঝিতে পারেন যে এক একটি উৎসবের শেষে ছাত্রদের সামাজিক জীবন কতখানি অন্তরঙ্গ ও সুসংস্কৃত হয়। ইহা ব্যতীতও এরূপ ঐ উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ছাত্রদের চারিত্রিক বিকাশ হয়, তাহারা দায়িত্বশীল হইতে শেখে। উৎসবানুষ্ঠান-পালনের ফলে তাহাদের সৌন্দর্যবোধ, রসবোধ ও রুচিবোধ বৃদ্ধি পায়; তাহাদের মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা ইত্যাদি গুণেরও প্রকাশ হয়; স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উৎসব পালনের মধ্য দিয়া তাহাদের মনে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতির সঞ্চার হয়; বুদ্ধ পূর্ণিমা, রবীন্দ্র জয়ন্তী ইত্যাদি উৎসব-পালনে তাহাদের কৃষ্টিগত

জীবন উন্নত হয় ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানলাভে সহায়তা করে। সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের সংগে এই উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বিদ্যালয়ের সংযোগ ঘটে।

বিদ্যালয়ের এই সামাজিক জীবনের ভিতর দিয়াই শিশুদের শিক্ষা সার্থক রূপ পায়। বর্তমানের শিশুশিক্ষার্থিগণই ভবিষ্যতের নাগরিক, তাহাদের নিকট হইতে সমাজ অনেক কিছু আশা করে। শিশুকাল হইতেই তাহাদের সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজের প্রতি প্রীতি ও মমতা বিদ্যালয়-জীবন হইতেই গড়িয়া উঠিতে পারে। এই হেতু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাহাদের জন্য যে সব বিভিন্ন কর্মের সুযোগ রহিয়াছে তাহা শিক্ষার্থীর বৃহত্তর সমাজজীবনের পটভূমিতে রচিত। শিল্পকাজ, সাফাই, কৃষি, উৎসব, অনুষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবকের কাজ, রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে তাহারা সহযোগী, পরিশ্রমী, পরহিতৈষী, আত্মবিশ্বাসী নাগরিক-রূপে গড়িয়া উঠিবে ও সমাজকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইবে।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকার অবাস্তবতা

দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের পাঠ্যতালিকা প্রধানতঃ বিষয়কেন্দ্রিক রহিয়াছে। বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকার অবাস্তবতা এবং অসুবিধার সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনা করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বিষয়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ

জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অসংখ্য এবং বহুমুখী। তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজনীয়। তাই জ্ঞানকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করা হয়; যথা—ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এই বিষয়-বিভাগে সাধারণতঃ দুইটি নীতি গ্রহণ করা হয়ঃ

১। বিষয়-বস্তুর পার্থক্য। প্রত্যেক জ্ঞানই কোন না কোন প্রাকৃতিক বিষয়- (Natural phenomenon) সংক্রান্ত। জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর পার্থক্য হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের নামকরণ করা হয়। যেমন, সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানকে সমাজ-বিজ্ঞান, প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলা হয়। এইগুলিকে আবার আরও ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন—ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি।

২। জ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করিবার সময়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা-লাভের পদ্ধতির কথাও বিবেচনা করা হয়। সাহিত্য, চারুকলা, দর্শন ইত্যাদি

বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায় কল্পনা, মানসিক অনুশীলন ইত্যাদি; আবার পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিতে জ্ঞানলাভের উপায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে। অন্যদিকে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির ক্ষেত্রে যেমন মানসিক অনুশীলনের প্রয়োজন, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। এই নীতি অনুসারে জ্ঞানকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে, (১) মানববিজ্ঞান (Humanities), (২) প্রকৃতি-বিজ্ঞান, (৩) সমাজ-বিজ্ঞান। ইহাদের প্রত্যেক ভাগকে বিষয়বস্তুর পার্থক্য অনুসারে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

যুক্তির ভিত্তিতেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে উপরি-উক্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যেভাবে জ্ঞান লাভ করে তাহাকে সংকীর্ণ বিষয়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তাজমহল দেখিতে গেলে ইতিহাস, ভূগোল, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান একসঙ্গে হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানকে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিতে ভাগ করা অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হয়। যতদিন আমাদের বিদ্যালয়ের জ্ঞান কৃত্রিম ছিল এবং উহা পাঠ্য-পুস্তক মুখস্ত করায় পর্যবসিত ছিল, ততদিন বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকা অনুসরণে কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণের নীতি গ্রহণ করার ফলেই বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকা অনুসরণের কৃত্রিমতা আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে।

এই অসুবিধা দূর করার জন্য পাঠদান-কালে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ (Co-relation) স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থার সাহায্যে পাঠদানের কৃত্রিমতা দূর হয় না। তখন ঠিক করা হয় যে, পাঠ্য-তালিকাকে এত অধিক সংখ্যক বিষয়ে ভাগ না করিয়া, তিনটি বড় ভাগে (Broad Fields) ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—মানব-বিজ্ঞান (Humanities), প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান। কিন্তু দেখা গেল যে, ঐরূপ বড় বড় বিষয়ের গণ্ডির মধ্যেও মানুষের অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাই অধুনাতম পাঠ্যতালিকা বিষয়কেন্দ্রিক না হইয়া কর্মকেন্দ্রিক হইয়া থাকে। ইহাতে ছাত্রেরা কি কি "বিষয়" পাঠ করিবে তাহার নির্দেশ না থাকিয়া, তাহারা কি কি "কাজে" লিপ্ত হইবে তাহার ইঙ্গিত থাকে।

অনুশীলনী

১। পাঠ্যক্রম নির্ধারণে কি কি নীতি মানিয়া লওয়া উচিত? বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে কি শিল্প-শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন?

২। "নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে শিশুকে উন্নততর সামাজিক পরিবেশের এবং বহুমুখী আগ্রহের পরিপূর্তির সুযোগ দেবার চেষ্টা করা হইয়াছে।" উক্ত পাঠ্যক্রম হইতে উদাহরণ উল্লেখপূর্বক দেখান যে কি প্রকারে এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। পাঠ্যক্রম-রচনার মূলনীতিগুলি আলোচনা করুন।

৪। অবিভাজ্য পাঠ্যক্রম কি? উদাহরণ দিয়া আলোচনা করুন—বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, এই দুইয়ের পার্থক্য কি?

৫। কর্ম ও অবিভাজ্যতার ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম-প্রণয়নের কথা চিন্তা করা হইয়াছে।—এই সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৬। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠ্যতালিকা আছে তাহাতে কতখানি পাঠ্যক্রমের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে?

৭। প্রচলিত পাঠ্যক্রমের মধ্যে এবং বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য কি? কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলিতে কি বোঝায়?

৮। পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য কি? এবং প্রয়োজনই বা কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার পদ্ধতি

"Another thing that we want is the abolition of the system which aims at educating our boys in the same manner as that of the man who battered his ass being advised that it could thereby be turned into a horse."

—*Swami Vivekananda.*

শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতির গুরুত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তু অপেক্ষা শিক্ষালাভের পদ্ধতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কি শিখিব এবং কিভাবে শিখিব উভয়ই বিশেষ বিবেচনার সহিত স্থির করিতে হয়। একদিন ছিল, যখন বিষয়বস্তুর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। জ্ঞানলাভ করাই ছিল মুখ্য, সুতরাং যে কোনও প্রকারে জ্ঞানলাভ করিলেই হইত। কিভাবে জ্ঞানলাভ করা হইল সেই অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হইত। এখনও অধিকাংশ ছাত্রই এই নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞানলাভ মাত্রকেই শিক্ষা বলা চলে না। জ্ঞান সক্রিয় না হইলে সে জ্ঞান জীবনে কার্যকরী হয় না। এই সক্রিয়তা শিক্ষা-পদ্ধতির উপর নির্ভর

করে। পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাহা সক্রিয় হইতে পারে না। নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা আপনিই সক্রিয় হইয়া পড়ে।

এই বিশাল পৃথিবীতে জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। কোন বিদ্যালয়ই জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ছাত্রদের দিতে পারে না। বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ হয় বাস্তব জীবনে তাহা আদান-প্রদানের (transfer) মধ্য দিয়াই সার্থক হইয়া ওঠে। জ্ঞানের আদান-প্রদান বা ব্যাপকীকরণ (transfer) সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করিলে জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইজন্য সাধারণতঃ বিদ্যালয় ও পরীক্ষার মধ্যেই বিদ্যালয়-সংক্রান্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার বাহিরে তাহার প্রয়োগ হয় না। লব্ধজ্ঞান ব্যাপকীকরণের ক্ষমতা শিক্ষা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকের নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তক হইতে আহৃত জ্ঞানকে বার বার আবৃত্তি দ্বারা স্বকীয় করিয়া লওয়ার চেষ্টাকেই শিক্ষার প্রকৃত পদ্ধতি বলিয়া ধরা হইত। ধ্যান-ধারণা দ্বারা ঐসব জ্ঞানকে স্বকীয় করা সম্ভব হইত।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি

বর্তমানকালে শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রুশো, প্যাষ্টালজী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌গণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দির শিক্ষাবিদ্‌গণও শিক্ষার ভার শিক্ষকের হাত হইতে শিক্ষার্থীর নিকট অর্পণ করিবার কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শিশুর স্ব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের ভিত্তি। শিক্ষকের মুখনিঃসৃত জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান শিশুর অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত না হইলে তাহা সক্রিয় জ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। প্যাষ্টালজী, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাসংস্কারকগণ কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচার করেন। নূতন পদ্ধতি হিসাবে ক্রীড়াকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর (Playway) তাঁহারা বিশেষভাবে জোর দেন। খেলাধূলা করা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্য দিয়াই শিশু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপায় করিয়া দিলে তবেই সেই জ্ঞান শিশুর জীবনে কার্যকরী হইবে। মন্তেসরী ও ফ্রয়েবেল কেবলমাত্র এই মতকে সমর্থনই করেন নাই,

শিশু মনস্তত্ব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ খেলার ও উপকরণের আবিষ্কারের দ্বারা উহাদের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

শিশুর কাছে খেলা এবং কাজের মধ্যে পার্থক্য তেমন গুরুতর নহে। খেলা এবং কাজ উভয়ক্ষেত্রেই শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে হয়। তথাপি খেলার জন্য যে পরিশ্রম বা কাজ করা হয়, কাজের জন্য কাজ করা অপেক্ষা তাহা অনেক ভিন্ন। খেলার ক্ষেত্রে মানুষ খেলার আনন্দ হইতে তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্তু কাজ যখন অর্থোপার্জন বা অন্য কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিয়ামক মাত্র, তখন স্বতঃপ্রবৃত্তির স্থান নাই; কাহারও আদেশ কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহাতে খেলার আনন্দ বা তৃপ্তি নাই। খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য উদ্দেশ্যগত; উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা হিসাবে একই ক্ষেত্র খেলা বা কাজ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। উদাহরণের সাহায্যে আমরা বলিতে পারি মানুষ যখন আপন আনন্দ ও তৃপ্তির জন্য গান গায়, তখন তাহাকে আমরা খেলা আখ্যা দিতে পারি; কিন্তু গানের পেছনে যখন অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য থাকে তখনই তাহা হয় কাজ বা পেশা। ইহাতে আনন্দ হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু এই দুই আনন্দে পার্থক্য অনেকখানি। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের মনের আনন্দে যে কাজে নিযুক্ত হওয়া যায় তাহাই খেলা। শিশু যদি ভয় বা অন্য কোন বাধ্যবাধকতার ভিতরে না থাকিয়াও বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাজ নিজের মনের আনন্দে করিয়া চলে, তবে খেলার ভিতর দিয়াই শিক্ষালাভ করিতেছে বলা চলে। শিশুর পাঠ্যক্রম যদি তাহার আগ্রহ ও প্রয়োজন-কেন্দ্রিক (need-centred) হয়, তাহা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত কাজের ভিতর দিয়াই তাহাকে অনুসরণ করা চলে। শিশু তাহার প্রয়োজন বা তাহার নিজের সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিবে ইহাই অধুনাতন শিক্ষা-পদ্ধতি। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি বর্তমানে কর্ম-কেন্দ্রিকরূপ লাভ করিয়াছে। জ্ঞানী এবং উপযুক্ত শিক্ষক নানাভাবে, নানা কৌশলে বিদ্যালয়ের কাজ শিশুর জীবনের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঐ সব কাজে তাহার স্বতঃ-প্রণোদিত সহযোগিতা পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালী (Project Method) ঐরূপ চেষ্টার একটি বাস্তব ফল। আমেরিকার New Education School মনিষী ডিউয়ীর

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশেষভাবে কর্মকেন্দ্রিক করিতে চেষ্টা করেন। কিলপেট্রিক ডিউয়ীর শিষ্য এবং অনুবন্ধ প্রণালীর আবিষ্কর্তা।

অনুবন্ধ প্রণালী

এই পদ্ধতি অনুসারে একটি বিশেষ সমস্যামূলক কাজকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা হয়। কাজটি এরূপ হওয়া চাই যাহার সহিত শিশুর জীবনের প্রয়োজনের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহই হইবে এই কাজের উৎস। অন্যদিকে কাজটি করিতে গিয়া শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আপনা হইতেই তাহাদের আয়ত্ত হইয়া যাইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 'বনভোজন'। এই কার্যে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল আছে। ইহার মধ্য দিয়া তাহার ক্রীড়াপ্রবণতার নিবৃত্তি হইতে পারে। অধিকন্তু ইহার মধ্য দিয়া সে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও অনেকখানি আয়ত্ত্ব করিতে পারে। বনভোজনের স্থান নির্ণয় করা, উহার জন্য বিভিন্ন জিনিষ ক্রয় করা প্রভৃতি প্রসঙ্গে, সে অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞান, গণিতের জ্ঞান প্রভৃতি পাইতে পারে। আবার বনভোজনের জন্য আহার্য সামগ্রীর সংগ্রহ করার মধ্য দিয়া শিশুকে সামাজিক জ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে। বনভোজন-সম্বন্ধে আপন মনোভাব প্রকাশ করার ভিতর দিয়া শিশুর ভাষা শিক্ষা হওয়াও সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র পাঠ্যতালিকাকে যথাসম্ভব কয়েকটি সমস্যামূলক কাজে ভাগ করিয়া লওয়া হয় এবং কর্মের মাধ্যমে অর্থাৎ ঐ সমস্যাগুলির সমাধানের মধ্য দিয়া শিশুরা জ্ঞানলাভ করে।

অনুবন্ধ প্রণালীই হউক, বা অন্য কোন প্রকার কর্মমাধ্যমে শিক্ষাই হউক

সৃষ্টিমূলক শিক্ষা

সবক্ষেত্রেই সৃষ্টিমূলক কর্মের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গতানুগতিক উপায়ে মুখস্থ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই সৃষ্টিমূলক কর্ম বলিতে কি বুঝি? অনেকে মনে করেন সৃষ্টিমূলক কর্ম বলিতে কেবল হস্তশিল্পকেই বোঝায়। ইহার পরিধি অনেক বিস্তৃত, ইহা আমাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মূলে নিহিত আছে।

সৃষ্টিমূলক কর্ম বা শিক্ষা বলিতে আমরা সেই শিক্ষাকেই বুঝি যাহা মানুষের মধ্যে নূতন কোন ধারণা বা ভাবের সৃষ্টি করে, কোন নূতন উপায়ের উদ্ভাবনে সহায়তা করে বা কোন কিছু সৃষ্টি করিতে প্রেরণা জোগায়। যাহাতে উপস্থিত জ্ঞান হইতে নূতন জ্ঞানে যাইবার প্রয়োজন এবং যে কাজে সফলতা লাভ করিতে হইলে কল্পনাশক্তির ব্যবহারের প্রয়োজন, যে কার্যসাধনে

সমস্যা আছে, সেইরূপ কর্মই প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র; এবং ইহার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই সৃষ্টিমূলক শিক্ষা-পদ্ধতি। এই শিক্ষা-পদ্ধতি মানুষের কল্পনা এবং আবিষ্কার-স্পৃহাকে উৎসাহিত করে। এই শিক্ষা উদ্দেশ্যমুখী এবং গঠনমূলক (Purposeful & constructive); মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার স্বকীয় শিক্ষাশক্তি-বিকাশের প্রয়োজন। এই শিক্ষা তাহাতে সাহায্য করে।

পৃথিবীতে ইতঃপূর্বে হয় নাই তেমন জিনিষ তৈরী বা আবিষ্কার করাই সৃষ্টিমূলক কাজ নয়। যাহা ইতঃপূর্বে অপরে করিয়াছে, তাহা পুনর্বার করিলেও সৃষ্টিমূলক হইবে, যদি সৃষ্টিকারী নিজের কল্পনা ও মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহা করে। কোন বস্তুর অবিকল প্রতিমূর্তি তৈরী করাতে কোন কল্পনা বা সৃষ্টির স্থান নাই। সৃষ্টিক্ষমতা তখনই প্রকাশ পায় যখন মানুষ আপন কল্পনা ও আবিষ্কারের ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। কবির সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার কবিপ্রতিভার মূলধন (Raw material); সুতরাং বিদ্যালয় জীবনে শিশুর অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের ক্ষমতাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের মূলধন। এই মূলধন ব্যতীত সৃষ্টিক্ষম মনের প্রকাশের সুযোগ খুব কমই আছে।

সৃষ্টিমূলক কর্ম প্রধানতঃ দুই রকমের

(১) কোনরূপ সহায়তা ব্যতীতই যে সমস্ত সৃষ্টিক্ষমতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায়। যেমন—খেলা, অভিনয় করা, নাচ, গান ইত্যাদি।

(২) শৈশবে শিক্ষা দেবার ফলে ধীরে ধীরে যে সমস্ত গুণের বিকাশ হয় ও তাহা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় পরিণত হয়। যেমন—কবিতা লেখা, রচনা বা গল্প লেখা, ডিজাইন করা ইত্যাদি।

এই সৃষ্টিশক্তি ও স্পৃহা অল্পবিস্তর প্রত্যেকের মধ্যেই সুপ্ত থাকে। শিক্ষাবিদ্ Emerson এই শক্তিকে 'ঐশী-শক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সৃষ্টির প্রবৃত্তি, সৃষ্টির ক্ষমতা ও সৃষ্টির কল্পনা পরস্পর সংযুক্ত। যদি শিশুর সৃষ্টির প্রবৃত্তি বা কল্পনা থাকে. তবে সৃষ্টির প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসিবে। সৃষ্টির ক্ষমতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) সৃষ্টি-স্পৃহা স্বতঃস্ফূর্ত, ইহা ইচ্ছাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়।

(২) ইহা শুধু চিন্তাতেই থাকে না, জটিল অনুভূতিতেও থাকে।

(৩) এই শক্তি শৃঙ্খলা মানে না, ইহা স্বাধীন সত্তা।

(৪) ইহার উদ্দেশ্যটি প্রয়োজনের তাগিদে নয়।

(৫) আত্মপর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখা যায় না। যেমন—শিল্পী চিত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; কারণ, সেই অনুভূতির বিশ্লেষণ করা যায় না।

(৬) ইহা সুযোগ ও যত্নের অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনস্তাত্ত্বিক করিতে হইলে শিক্ষার্থীর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের সহিত তাল রাখিয়া করিতে হয়। শরীর ও মনের বিকাশের স্তর এবং পারিপার্শ্বিক অনুসারে তাহাদের জীবনের সমস্যা বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকের মধ্যে যে সৃষ্টিশক্তি থাকে, তাহার উন্নতি বিকাশ স্তরের উপরে নির্ভর করে। কাজেই যে শিক্ষা-পদ্ধতি শিশু-জীবনের সমস্যার সঙ্গে তাহার শিক্ষার সংযোগ সাধন করে এবং বিকাশের স্তর ও পারিপার্শ্বিক হিসাবে তাহাদিগকে সৃষ্টিমূলক কর্মে লিপ্ত হইবার সুযোগ দান করে তাহা মনস্তত্ত্বসম্মত শিক্ষা-পদ্ধতি।

শিশু শিক্ষায় সৃষ্টিমূলক কার্যের স্থান

এই সৃষ্টিমূলক শিক্ষা শিশুর জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। শিশুর জীবনে এই শিক্ষার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য যে কত অপরিসীম, আলোচনা দ্বারা তাহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমরা দেখিতে পাই যে শিশু সাধারণতঃ কর্মপ্রবণ ও স্বভাবশিল্পী। নিত্য নূতন কাজে লিপ্ত হইতেই তাহাদের আনন্দ। তাহাদের কল্পনা-শক্তিও অত্যন্ত প্রবল। তাহারা তাদের জীবনের গণ্ডি ছাড়াইয়া রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াসী! সৃষ্টিমূলক কাজ তাহাদিগকে এই কল্পনা-শক্তির ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ দান করে। সৃষ্টির প্রবৃত্তি সকলেরই সহজাত প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তিকে যথাযথ স্ফুরণের ও মার্জিত করার সুযোগ দিলে শিশুর সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ, কলানুরাগ, সহজাত বৃত্তির নব নব বিকাশ, ও অভিব্যক্তির সুযোগ দেওয়া হয়। সৃষ্টি করিবার সুযোগের মধ্য দিয়াই শিশু কর্মের মর্যাদা ও মূল্য দিতে শেখে। ইহাতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় বলিয়া শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আবার এই সৃষ্টিশক্তি কুনিয়ন্ত্রিত হইলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন আমরা

সৃষ্টিমূলক শিক্ষার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য

দেখিতে পাই—আধুনিক মেধাবী চোর-ডাকাতেরা তাহাদের সৃষ্টিশক্তিকে কুপথে চালিত করিয়া দেশ ও সমাজের প্রভূত অনিষ্টসাধন করে। এই সৃষ্টি-ক্ষমতাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর পথে পরিচালিত করিবার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব!

অন্যদিকে সৃষ্টিশক্তিকে অনেকখানি সার্থক করার মধ্য দিয়া সমাজের চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া সৃষ্টিমূলক কাজ সমাজের সহিত শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা কাজ করিয়া থাকি। বনভোজন করা, যাদুঘর দেখা, কাপড় বোনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্মেরই একটি সামাজিক দিক্ আছে। একদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করা, অপরদিকে সামাজিক জ্ঞান দান করা। সৃষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যই সার্থক হইয়া থাকে। ঐরূপ কাজের দ্বারা একদিকে যেমন শিশুগণ সৃষ্টিশক্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়, অপরদিকে সামাজিক জ্ঞানলাভেরও যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের সামনে উপস্থিত হয়। যৌবনে সৃষ্টির প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। সৃষ্টি ও আবিষ্কার ঐ বয়সের বিশেষ ধর্ম। কিন্তু শৈশবে যে সৃষ্টিশক্তির বিকাশের সুযোগ পায় না, পরবর্তীকালে তাহার সে শক্তির অপচয় ঘটে; এবং তাহার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়; অনেক ক্ষেত্রেই সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, ফলে তাহার জ্ঞানার্জনের শক্তিও হ্রাস পায়। ইহাতে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে দশজনের একজনরূপে গণ্য হইবার আগ্রহ শিশুর স্বাভাবিক। ছোট হইলেও বয়স্কদের মত সমাজে সে নিজের স্থান করিয়া লইতে চায়। তাই তাহার কাজ সামান্যতম সামাজিক মূল্য পাইলেও তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—শিশু ক্ষুদ্র পুতুল গড়িয়া বিদ্যালয়ের আনন্দমেলায় ২।১ পয়সা দামেও বিক্রয় করিতে পারিলে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করে। সুতরাং যদি শিশুর পাঠ্যক্রমে এমন সৃষ্টিমূলক কাজের স্থান দেওয়াও হয় যাহার সামাজিক মূল্য আছে, শিক্ষার দিক্ হইতে তাহা অধিকতর মূল্যবান্ হয়। এইরূপ সামাজিক কাজে অংশ-গ্রহণের দ্বারা শিশু তাহার ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করে। কাজ করিতে করিতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীদের সহিত সহযোগিতার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহারা অনেক জ্ঞান আহরণ করে।

এই সৃষ্টিমূলক কর্মের ক্ষেত্রে শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। প্রত্যেক

শিশুই স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বাধীনতা দিলে শিশুর নিজ ক্ষমতার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে। অঙ্কনের ক্লাসে যদি শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের অঙ্কিত ছবি নকল করিয়াই বরাবর আঁকে, তবে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ক্ষমতাকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করা হয়। অথচ স্বাধীনভাবে কিছু করিবার মধ্যে শিশুর বিচার-ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ-শক্তি ইত্যাদির পরিচয় সহজেই পাওয়া যায় এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান-পদ্ধতিও সেখানে সার্থক হয়। একজন বড় শিল্পী বলিয়াছেন—'শিক্ষক শুধু শিশুর কল্পনা শক্তির ঢাকনাখানি খুলিয়া দিবেন এবং ইহার ফলে শিশুর সৃষ্টি হইয়া উঠিবে অপূর্ব।'

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিও আর একটি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি। শিক্ষার ভিতর দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে জাতীয় জীবনের উপযোগী নয় ইহা সর্বজনস্বীকৃত। এই শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব আনিলেন মহাত্মা গান্ধী, জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাতিকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িতে চাহিলেন তিনি তাঁহার প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি 'নই তালিম'-এর সাহায্যে। নই তালিমের প্রাথমিক স্তর, বুনিয়াদী শিক্ষা ক্রমশঃই সাধারণ্যে স্বীকৃত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে শিক্ষা-পদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকতর মর্যাদালাভ করিবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও 'নই তালিমের' প্রসার কিভাবে এবং কতদূর হওয়া সম্ভব তাহা লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে এবং অনেক স্থানেই ঐ পদ্ধতিতে কিছু কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি মহাত্মাজীর দৃষ্টিগোচর হয়।

(১) আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুস্তককেন্দ্রিক। বিদ্যালয়ের জ্ঞানের সহিত সমাজ-জীবনের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। বিদ্যালয়ের জ্ঞান শুধু পরীক্ষা পাশ করিতেই সাহায্য করে। জীবনের ক্ষেত্রে তাহা বিশেষ কোন সাহায্যই করে না। ফলে দিন দিনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

(২) আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কখনও সর্বসাধারণের জন্য ছিল না। শিক্ষিতগণ নিজেদিগকে এক পৃথক্ জাতি বলিয়া গণ্য করিতেন এবং কোন-

রূপ শারীরিক পরিশ্রমকে অসম্মানজনক মনে করিতেন। ফলে নিরক্ষর সাধারণ দেশবাসীর সংগে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের মনের এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইত এবং শিক্ষালাভান্তে গ্রামের লোকেরা আর গ্রামে বাস করিতে পারিত না।

(৩) আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত এবং যথেষ্ট বিদ্যালয় খুলিবার আর্থিক সামর্থ্যের অভাব। তাই আমাদের বিদ্যালয়গুলি যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজনীয়।

(৪) সমাজের উপযুক্ত নাগরিক গড়িয়া তোলা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের দেশকে বর্তমান অনুন্নত অবস্থা হইতে দ্রুত উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হইলে যথেষ্ট-সংখ্যক সমাজ-সেবকের প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেককেই অল্পবিস্তর সমাজসেবায় লিপ্ত হইতে হইবে। ছাত্র-জীবনই সামাজিক শিক্ষা-লাভের উপযুক্ত সময়, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়গুলি কখনও এই দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

শিক্ষার এই ত্রুটিগুলি নিরসনের জন্য ১৯৩৭ সালের ২২ ও ২৩ অক্টোবর মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ওয়ার্ধায় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার জন্য একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে জাকির-হোসেন কমিটির হাতেই নই তালিমের শিক্ষাক্রম রচনার ভার পড়ে। এই পরিকল্পনাটি 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। মহাত্মাজী নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করেন।

(১) সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। সহরের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এক হইতে পারে না। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) মানুষের তিনটি প্রধানতম প্রয়োজনের নিবৃত্তিই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইবে। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়—মানুষের জীবনের প্রধানতম প্রয়োজন এই তিনটি।

(৩) শিক্ষা-পদ্ধতি শিল্পকেন্দ্রিক হইবে এবং এই শিল্পটি উৎপাদনাত্মক হইবে। পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর না দিয়া ছাত্রদের অভিজ্ঞতার উপরেই অধিকতর জোর দিতে হইবে। কর্মের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারাই ছাত্রগণ শিক্ষা করিতে পারে। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মকেই একমুখী করা প্রয়োজন। স্থতরাং কোন একটি বিশেষ শিল্পকাজকে কেন্দ্র করিয়াই বিদ্যালয়ের সমস্ত

কাজ অগ্রসর হইবে। কিন্তু এই শিল্পটি এমন হওয়া চাই, মানুষের আদিমতম প্রয়োজন তিনটির নিঃবৃত্তি যাহাতে ইহার ভিতর দিয়াই ঘটিতে পারে। তাই বুনিয়াদী শিক্ষায় কৃষি, বয়ন ও কাঠের কাজের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরেই এই কেন্দ্রগত শিল্পটির নির্বাচন নির্ভর করে। ছাত্রের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই শিল্প কাজটিকে অবলম্বন করিয়াই শিক্ষা চলিতে থাকিবে। ছাত্ররা শিল্প-শিক্ষার দ্বারাই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিবে এবং তাহা শিক্ষা করিতে গিয়া লেখা, পড়া ও গণিত ইত্যাদিও শিক্ষা করিবে। অন্যদিকে মানসিক পরিশ্রমের সংগে কায়িক পরিশ্রমের ব্যবস্থার দরুণ ছাত্রগণ কায়িক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইবে। শৈশবের এই সু-অভ্যাসের ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের আত্মবিশ্বাস জন্মিবে ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করায় তাহারা গ্লানিবোধ করিবে না।

(৪) বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাবলম্বী শিক্ষা হইবে। উৎপাদনাত্মক শিল্পের দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয় অন্ততঃ আংশিকভাবে নির্বাহিত হইবে।

(৫) সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হইবে।

(৬) ৭ বৎসরের জন্য (৭-১৪ বৎসর) সমগ্র জাতির পরিপ্রেক্ষিতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের প্রয়োজন।

(৭) অহিংসা ও ত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা গড়িয়া উঠিবে। জাকির হোসেন কমিটি এই শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করিলেও কেন্দ্রিয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি, শিক্ষার্থীর উৎপাদনাত্মক শিল্পের বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হইবে—এই মত স্বীকার করেন নাই। তাহারা মনে করেন ইহা গ্রহণ করিলে শিল্পশিক্ষার অর্থনৈতিক দিক্ অধিকতর গুরুত্ব লাভ করার ফলে, শিক্ষার দিক্ ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে গিয়াও ইহার মূল নীতিতে ও শিক্ষা-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে।

১। দেখা গিয়াছে যে শুধু শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত জ্ঞান দেওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া সহজ বলিয়া বর্তমানে এই নীতি সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২। অধিকাংশ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই শিক্ষণীয় শিল্পকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—প্রধান শিল্প (major craft) ও সহকারী শিল্প (subsidiary craft)। কৃষি, বয়ন ও কাঠের কাজকে প্রধান রাখিয়া পুতুল তৈরী, মাদুর তৈরী ইত্যাদিকে সহকারী শিল্পরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই সাধারণতঃ একাধিক শিল্পকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিভিন্নরূপ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ৭ বৎসর হইতে ছেলেরা আসে। ৭ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত নিম্নবুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষা এখানেই শেষ হয়। তাহার পর ১১ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা

বুনিয়াদী শিক্ষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বিভিন্ন মতামত শুনিতে পাওয়া যায়। এই শিক্ষা-পদ্ধতির স্বপক্ষে বলা হয় যে, কর্মকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে শিক্ষার্থী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে জ্ঞানলাভ করে, তাহা সজীব এবং জীবনের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়।

২। এই শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপেই ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের ধারক। ভারতের মাটির সহিত ইহা নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

৩। বুনিয়াদী শিক্ষা শরীর, মন, চরিত্র, সামাজিক জ্ঞান ও দেশীয় কৃষ্টির উপর সমান জোর দেওয়ার ফলে পূর্ণতর ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তোলে।

৪। এই বিদ্যালয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজসেবার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়।

এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তি আনা হইয়াছে :—

১। ইহাতে শিশু-মনস্তত্ত্বকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। স্বাবলম্বী কোন একটি শিল্পকে প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করায় এই শিক্ষার ব্যবস্থাতে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, এই শিক্ষা-পদ্ধতি শিশুকেন্দ্রিক নয়, ইহা শিল্পকেন্দ্রিক-পদ্ধতি হইয়াছে। শিশুর আগ্রহ, যোগ্যতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া শিল্প-শিক্ষার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করা হয়। যে সব শিল্পে সাধারণতঃ

শিশুকে নিয়োগ করা হয়, তাহার শরীর ও মন অল্প বয়সে উহার জন্য প্রস্তুত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ৭ বৎসরের শিশুর মাংসপেশী ছুতারের কাজের জন্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। আবার বয়স্ক জীবনের প্রয়োজনগুলিকে ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিল্প নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এই প্রয়োজন মুখ্যতঃ বয়স্কদের প্রয়োজন, - শিশুমনে ঐগুলি কোন আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারে না—তাহার বর্তমান জীবনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; কাজেই ঐ সমস্ত শিল্পকর্মে প্রবৃত্ত হইতে তাহার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকিবার কথা নয়। দীর্ঘ সময় একই কাজে নিযুক্ত থাকা শিশুর পক্ষে কষ্টকর —সূতা কাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজের একঘেয়েমি শিশুপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

২। উৎপাদনাত্মক ও সৃষ্টিমূলক কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। নিত্য নূতন সৃষ্টিতে সৃষ্টিমূলক কাজের সার্থকতা; একই জিনিষ দিনের পর দিন একই ভাবে করিয়া যাওয়া যান্ত্রিকতা। নিজ প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্য দিনের পর দিন বিশেষ কোন নমুনা-বিহীন খদ্দরের কাপড় বুনিয়া যাওয়াকে বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূতা কাটিয়া যাওয়াকে সৃষ্টিমূলক কাজরূপে আখ্যা দেওয়া কঠিন। সৃষ্টিমূলক কাজে সৌন্দর্যবোধের এবং নিত্য নূতন অনুভূতির প্রচুর সুযোগ থাকে। যান্ত্রিক কাজ মনকে যান্ত্রিক করিয়া তোলে। প্রথমটি একঘেয়ে ক্লান্তিকর ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে—শিশুর স্বাধীন বিকাশ, কিছু সৃষ্টি করিবার অফুরন্ত শক্তি, নির্ভয়ে কাজ করিবার মত মনোভাব জন্মে। বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এই মত পোষণ করে যে ১২ বৎসরের পূর্বে কোন শিশুকে অর্থোপার্জনে নিয়োজিত করা উচিত নয়।

৩। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এই শিক্ষা-পদ্ধতি শ্রেণীহীন, প্রতিযোগিতাহীন, সমাজগঠনের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সাধারণতঃ এই শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রামের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে—সহর এবং শিল্পাঞ্চলে ইহার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্যজীবনের কথা চিন্তা করিয়াই গান্ধীজী এই পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রামের জন্য একরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সহর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য অন্যরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা হইলে, শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকারের নীতি ক্ষুণ্ণ হয়—গ্রাম ও সহরের লোক দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

৪। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি কোন এক বিশেষ শিল্পের মাধ্যমে, এমন কি একাধিক শিল্পের মাধ্যমেও দেওয়া সম্ভব নয়। জাকির হোসেন কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকার, এবং কোন কোন প্রাদেশিক সরকার শিল্পকেন্দ্রিক পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন; কিছু কিছু শিল্প-কেন্দ্রিক পাঠ্যপুস্তকও বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রের কোনটিতে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ এখনও হয় নাই।

ঐ সব পাঠ্যতালিকায় মধ্যে মধ্যে ছেদ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকেন্দ্রিক করিবার চেষ্টার ফলে পাঠ্যতালিকা কিছু অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ঐরূপ চেষ্টা এখনও ফলবতী হয় নাই। পাঠ্যপুস্তকের দিক্ দিয়া অবস্থা অধিকতর মন্দ। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সমস্ত পঠনীয় বিষয়গুলির উপর কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্য-পুস্তক এখনও প্রণীত হয় নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা কারিগরী শিক্ষা নয়

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি উল্লেখ করিতে যাইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইহা কারিগরী শিক্ষার নামান্তর। তাহারা বলেন এখানে একটি বিশেষ শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেই শিল্পটি উৎপাদনাত্মক। আট বৎসরব্যাপী শিশু একই শিল্প বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে যখন সে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করে, তখন ইহাকেই সে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষাকালেও এই উৎপাদনাত্মক শিল্পটির দ্বারা তাহারা তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে কারিগরী শিক্ষা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে বুনিয়াদী শিক্ষাই শিক্ষা নয়। এখানে শিল্প-শিক্ষাটা মুখ্য নয়—ইহা শিক্ষার একটি পদ্ধতিমাত্র। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা শিশুদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বাস্তব হইবে আশা করিয়াই শিক্ষাকে শিল্প-মাধ্যম করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কারিগরী শিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। কারিগরী শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনের দ্বারা তাহাকে সমাজের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা। শিক্ষার এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া

গড়িয়া তোলার নিমিত্তই শিল্পকে একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া কিভাবে শিশুকে বিভিন্ন দিকে শিক্ষিত করিয়া তোলা যায় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে শিশুই প্রধান, শিল্পটি নয়। স্থতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সম্পূর্ণই শিশুর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয়; বিদ্যালয়কে একটি ছোটখাট সমাজে রূপান্তরিত করা হয়। তৃতীয়তঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে শিল্প ছাড়াও অন্যান্য বিষয়, যেমন—নাচ, গান, খেলা, সাফাই, পরিবেশ-পরিচিতি ও বিভিন্ন-জ্ঞানমুখী শিক্ষা, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদির স্থান আছে। কারিগরী শিক্ষায় ইহার কোন স্থান নাই। স্থতরাং বুনিয়াদী শিক্ষাকে আমারা শিল্প শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষার নামান্তর বলিতে পারি না। বুনিয়াদী শিল্পকে উৎপাদনাত্মক ও শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করিবার পেছনেও মহাত্মাজীর এক স্থচিন্তিত দার্শনিক সত্য আছে। মহাত্মাজী সত্য, ন্যায়, অহিংসা ও সাম্যের ভিত্তিতে এক স্থন্দর ও স্থখী সমাজ গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। যে সমাজে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন নাই সে সমাজ সত্য, ন্যায়, অহিংসা ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের সেই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা আবার ফিরিয়া পাইতে হইলে ভারতের প্রত্যেক লোককে আবার কর্ম ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন হইতে হইবে—তাহাদের বর্তমান মনোভাবকে পরিবর্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনের সংগে যুক্ত করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষাকে ও শিল্পকে উৎপাদনাত্মক করিবার কথা মহাত্মা গান্ধী চিন্তা করিয়াছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কার্যে পরিণত করিতে গিয়া আমাদিগকে কয়েকটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নিম্নে তাহার আলোচনা করা গেল।

(১) বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর অভাব রহিয়াছে। বিশেষতঃ ঐ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীগণ তাহাদের শিক্ষার (training) জন্য মাত্র এক বৎসরের সময় পান। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পক্ষে একাধিক শিল্প যথেষ্ট দক্ষতার সহিত শিক্ষা করা সম্ভব হয় না যাহাতে তাহারা উপযুক্তভাবে শিল্প-মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারেন।

(২) এই শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লিখিত উপযুক্ত এবং যথেষ্ট সংখ্যায় পুস্তকের অভাব। ৭ বৎসর বয়সে শিশুর দেহ ও মন শিল্প-শিক্ষা-গ্রহণের উপযুক্ত হয় কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়। অধিকন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুসারে ছাত্রগণ যদি শিল্পের ভিতর দিয়া নিজ প্রয়োজনের নিবৃত্তির চেষ্টা করে তাহা হইলে শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টিমূলক না থাকাই সম্ভব।

(৩) আশা করা গিয়াছিল যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা অল্প-ব্যয়সাধ্য হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা অধিকতর-ব্যয়সাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪) কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার ফলে এবং শিল্পকে বিদ্যালয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা জ্ঞানের শিক্ষা কম হয়। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসিবার পরে লেখাপড়ায় পিছাইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিবার পরে যাহারা গ্রামে বাস করিবে ও সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিবে তাহাদের পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা যে বিশেষভাবে উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সমস্ত ছাত্র উচ্চ-শিক্ষালাভের আশা রাখে তাহাদের পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি কতখানি উপযুক্ত এ সম্বন্ধে অনেকের মনে এখনও সন্দেহ আছে। ফলে—গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পিতামাতার সন্তানেরা সাধারণতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পড়িয়া আসিতেছে এবং সহরাঞ্চলে এই পদ্ধতির বিশেষ প্রচার হয় নাই। যতদিন পর্যন্ত না দেশের সমস্ত বিদ্যালয়গুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী ও নির্ধন সমান সুযোগ পাইবে না বলিয়া মনে করা অনুচিত নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির সহিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক মিল আছে। অনেকের মতে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপই বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি। সাধারণতঃ মিলগুলি এইরূপ :—

(১) উভয় শিক্ষা-পদ্ধতিই কর্মকেন্দ্রিক। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মকে উভয়েই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে। (২) একটি নির্দিষ্ট কর্মকে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিভিন্ন দিক্ ও বিষয়গুলি পরস্পরের সমন্বয়ে শিক্ষাদানের নীতি উভয় পদ্ধতিতে অবলম্বন করা হইয়াছে। (৩) শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি

আগ্রহ সৃষ্টি করা ও বিদ্যালয়ে সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তোলা এবং সমাজের সংগে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা উভয় পদ্ধতির নীতি।

ইহাদের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনই বৈসাদৃশ্যও কম নয়। নিম্নরূপভাবে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। (১) বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে একটিমাত্র প্রধান কর্মকে (শিল্পকে) কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার চেষ্টা চলে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য একাধিক কর্মকে গ্রহণ করা চলিতে পারে। এই পদ্ধতিতে শিশুর আগ্রহের প্রতিই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন সমস্যামূলক কার্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও চলে। যেমন—একই শ্রেণীর ছাত্রগণ একদিকে যেমন ইতিহাস শিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতে যাইতে পারে, অপরদিকে ভূগোল শিক্ষার জন্য ম্যাপ, মডেল ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোন একটি শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হয়। তাই ইহাকে শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতিও বলা যাইতে পারে। যাহার সামাজিক মূল্য আছে সে রকম কর্মই ছাত্রদের জন্য নির্ধারণ করা হয় ও তাহাতেই তাহাদের আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা হয়। এই কর্ম উৎপাদনাত্মক হয়। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে কর্মের কোন বিশেষ সামাজিক মূল্য নাও থাকিতে পারে এবং কর্মটিকে উৎপাদনাত্মক করিবার চেষ্টা করা হয় না। কর্ম কোন না কোনরূপ শিল্প হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যেমন অংক শিক্ষাদানের জন্য অনেক সময়ে ছাত্রদের 'দোকান দোকান' খেলার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(৩) খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়—জীবনের এই তিনটি প্রয়োজনের প্রতি বুনিয়াদী শিক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ই পারিপার্শ্বিকের তারতম্য হিসাবে কৃষি, বয়ন ও কাঠের কাজ—ইহাদের একটিকে প্রধান শিল্পরূপে গ্রহণ করে। অন্যান্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও সাধারণতঃ প্রধান শিল্পটিকে কেন্দ্র করিয়াই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দেখা যায় এই তিনটি কাজই বয়স্ক জীবনের সমস্যা। ইহাদের একটির সংগেও প্রকৃতপক্ষে শিশুজীবনের আগ্রহ বা সমস্যা জড়িত নাই। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিশুর প্রত্যেকটি কর্ম বা সমস্যা তাহাদের বর্তমান জীবনের সংগে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। এমনকি পূর্ব হইতে কোন কর্ম বা কোন বিশেষ

সমস্যা তাহাদের জন্য স্থির করা থাকে না। তাহাদের আগ্রহ ও প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তাহারা কর্ম ঠিক করে এবং শিক্ষক তাহাদের এই আগ্রহ ও প্রয়োজনের সুযোগে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেন। অনেক সময়ে কর্মের সহিত শিক্ষণীয় জ্ঞানের দিক্ ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। যেমন ম্যাপ তৈরী করিতে গিয়া, ভূগোল, অংক, লিখন ইত্যাদি বিষয়গুলি অনায়াসেই আসিয়া যায়।

(৪) বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রমের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। বিদ্যালয়ে কর্ম নির্বাচনের মধ্য দিয়াই ছাত্রদের মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাহার প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মে। তাহারা যখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের নিজেদের পরিচ্ছদ তাহারা নিজেরাই তৈরী করিয়া নিতে পারিবে অথবা কৃষিকর্মের মধ্য দিয়া শাকসব্জির প্রয়োজন নিজেরাই মিটাইতে পারিবে, তখনই তাহারা শ্রমের প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আগ্রহ হয়ত কোন কর্মে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। অথচ এই আগ্রহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তাহারা শ্রমের প্রতি বিশেষভাবে মর্যাদাসম্পন্ন হয় না। কর্ম-নিরপেক্ষ বলিয়া ইহাতে সৃষ্টির স্থান অধিক। অন্যদিকে বুনিয়াদী শিক্ষাতে সৃষ্টিমূলক কর্মের ততটা সুযোগ নাই। সূতা কাটিয়া কাপড় বোনার মধ্যে সৃষ্টির অংশ বেশী থাকে না।

(৫) বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতে চায়। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে সমাজসেবাও বিদ্যালয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। এইজন্য এখানে সাফাইকে একটি বিশেষ স্থান দিয়া থাকে। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সমাজসেবার উপর এরকম কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে, যদিও কোন কোন প্রদেশ কিংবা কোন কোন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এখনও অনেকটা রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করা চলে—

(১) যদিও প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয় এক বা একাধিক শিল্প শিক্ষা দিয়া থাকে এবং এই কাজের জন্য কার্যসূচীতে অনেকখানি সময় নির্দিষ্ট থাকে, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য নানারকম সমস্যামূলক কর্মের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষককে

শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণ-পরীক্ষাকালে (Practice teaching) প্রায়ই কার্যসমস্যা-পদ্ধতিতে বা শিশুদের আগ্রহের উপরে ভিত্তি করিয়া পাঠ দিতে দেখা যায়।

(২) কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিতে বলা হইয়াছে। পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান সমস্যামূলক কার্য-শিক্ষা-পদ্ধতিরই এক দিক্।

(৩) স্বাবলম্বী শিক্ষার নীতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ফলে শিল্পকে উৎপাদনাত্মক না করিয়া সৃষ্টিমূলক করিবার বিভিন্ন সুযোগ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে।

(৪) বিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বুনিয়াদী শিক্ষা এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় তফাৎ আরও কমিয়া আসিবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষা নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার বিভিন্ন সুবিধাগুলি গ্রহণ করিবে, এই রকম আশা করা অন্যায় নয়। ভবিষ্যতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে আমরা নিম্নলিখিতরূপে কল্পনা করিতে পারি—

(ক) এই বিদ্যালয়ে কোন না কোন শিল্পের স্থান অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু ঐ শিল্পগুলি বয়স্কদের প্রয়োজন বিচার করিয়া নির্বাচিত হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুজীবনের জন্যই এবং শিশুর দেহ-মনের উপযোগী করিয়াই সেই শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শিল্প নির্বাচনকালে শিশুর ক্ষমতা, প্রয়োজন ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সৃষ্টিমূলক ও সম্বন্ধযুক্ত শিক্ষার উপযোগী কোন শিল্পকে শিক্ষাদানের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিশুদের শিল্পকর্ম সামাজিক মূল্য পাইলে তাহারা খুব আনন্দ পায়। ইহা তাহাদের শারীরিক পরিশ্রমের প্রতি মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তোলে এবং তাহাদের চরিত্রগঠনেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। কিন্তু এই একটি শিল্পই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হইবে না—ইহা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের মধ্যে একটি মাত্র।

(খ) যদিও শিশুগণ কর্ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই শিক্ষা গ্রহণ করিবে, তথাপি উচ্চ শ্রেণীতে (তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম) পুস্তকের সাহায্য

গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। শিশুদের মধ্যে পুস্তক পাঠের অভ্যাস ও তাহাতে আগ্রহ-সৃষ্টির জন্য পুস্তক ও গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

(গ) বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহার পাঠ্যতালিকা এবং বিভিন্নরূপ শিল্প ও কর্ম বর্তমানের ন্যায় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হইবে। সমাজসেবার উপর সমান গুরুত্বই থাকিবে।

(ঘ) চরিত্রগঠনকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের সমাজ ও তাহার বিভিন্ন কর্মকে সেইভাবে পরিচালিত করা হইবে।

অনুশীলনী

১। শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতির গুরুত্ব কতখানি? কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। ওয়ার্ধা পরিকল্পনাটির সমালোচনা করুন।

৩। বুনিয়াদি শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে তফাৎ কি? 'বুনিয়াদি শিক্ষা শিল্প-শিক্ষার নামান্তর'—এই উক্তির যৌক্তিকতা সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৪। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও পরিবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ নীতিতে পার্থক্য রহিয়াছে।

৫। অনেকে বলেন বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি নয়—এ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৬। সৃষ্টিমূলক শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়? শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার স্থান নির্দেশ করুন।

৭। সৃষ্টিমূলক শিক্ষায় সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্য ব্যাখ্যা করুন।

৮। সৃষ্টিমূলক শিক্ষা ও উৎপাদনাত্মক শিক্ষার পার্থক্য আলোচনা করুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান

The true teacher who can immediately come down to the level of the student, and transfer his soul to the student's soul and see through and understand through his mind."

Swami Vivekananda.

আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। একদা শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়ের কেন্দ্র। সকলে মনে করিত তিনি অনন্তজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং তিনি ছাত্রদের প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী এই জ্ঞান তাহাদিগকে দিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। তখন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক; বিদ্যালয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান কর্মী; ছাত্র গ্রহণকারী মাত্র।

কিন্তু বর্তমান যুগ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ; আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে বিদ্যালয়কে শিশুকেন্দ্রিক করিবার চেষ্টা চলিতেছে। শিক্ষকের অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার শিশুকে উজাড় করিয়া দিতে চাহিলেও তাহারা উহার অংশমাত্র গ্রহণেও সক্ষম না হইতে পারে। এখানেই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক গ্রহণ-ক্ষমতার কথা ভাবিতে হয়। শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক হইবে; নিজ চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই তাহারা শিক্ষালাভ করিবে। শিক্ষকের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের শিক্ষার নিয়ামক নয়। তবে কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কোন প্রয়োজন নাই? কিংবা তাঁহার দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা লঘু হইয়াছে?

বাস্তবিকপক্ষে ইহা সত্য নয়। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি মতে শিক্ষকের গুরুত্ব তো কমেই নাই, বরং তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্যভার অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বের ন্যায় জ্ঞানার্জন ও তাহার যোগ্যতা দ্বারাই বর্তমানে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয় না; শিশু আপন অভিজ্ঞতায় জ্ঞান লাভ করিলেও শিক্ষকই তাহার নেতৃত্ব করেন। তিনি এখন শিক্ষার্থীর নিকট উপদেষ্টা ও পরিচালক (Guide), বন্ধু বা মিত্র (Friend) ও জীবন-দর্শন-বিদ দার্শনিক (Philosopher); বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষক অনেকটা দলপতির কাজ

করিয়া থাকেন। তাঁহার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বের জন্যই ছাত্রগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার হস্তে এই দায়িত্ব অর্পণ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে শিক্ষকের মনেই শুধু স্পষ্ট ধারণা থাকে, ছাত্রদের থাকে না। যাহাতে ছাত্রগণ এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করিতে পারে তাহার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালী, সময়সূচী, পাঠ্যতালিকা, উপযুক্ত সরঞ্জামাদির (যথা, পুস্তক, খেলার সরঞ্জাম ইত্যাদি) ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হয়। এই সমস্ত কাজে ছাত্রগণের সহযোগিতা এবং মতামত তিনি গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু এই পরিকল্পনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁহারই। এককথায় পূর্বে শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়-সমাজে একেশ্বর, বর্তমানে তিনি গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়-সমাজের নায়ক। তাঁহার কর্তব্যের গুরুত্ব একটুও কমে নাই, বরং তাহা আরও কঠিন ও বিস্তৃত হইয়াছে। জাহাজ চালনা করে নাবিকেরাই, কিন্তু নির্দিষ্ট বন্দরে পৌছাইতে পথের নির্দেশ দেন নৌ-সেনাপতি; পথের বিঘ্ন-বিপদে তিনিই পরামর্শ দেন, তিনিই হাল ধরেন সমস্ত দায়িত্বের। শিক্ষক সেই নৌ-সেনাপতি! শিক্ষাকে অগ্রগতির পথে লইয়া চলে ছাত্ররাই; কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সফল করিতে, ছাত্রদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে শিক্ষকের সুদক্ষ পরিচালনার প্রয়োজন।

এইবার বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কি কি কর্তব্য—সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা প্রয়োজন:—১। শিক্ষার্থীর সর্বাংগীন বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষকের। ইহার জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহিক পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। পরিবেশ অনুকূল না হইলে শিশুর বিকাশের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবও অনেকাংশে শিশু-জীবনে কার্যকরী হয়। ছাত্রদের চরিত্র-গঠনে তাঁহার অবদান অনেকখানি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে তাঁহার সাহচর্য ও সহযোগিতার সুযোগ দিলে ইহা সহজ হইতে পারে।

২। পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের নির্ধারণে তাঁহার যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ ও সামাজিক অবস্থা তাঁহার জানা থাকে। এই সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়াই শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন সাধারণতঃ Text Book Committee অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক-পরিষৎ করিয়া থাকেন, তবু পাঠ্য-সূচী নির্ধারণে শিক্ষকের অনেকখানি স্বাধীনতা আছে। তিনি ছাত্রদের সহযোগিতায় ইহা করিবেন।

৩। বিদ্যালয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে কতকগুলি নিয়ম-কানুনের প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে দৈনন্দিন কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। ছাত্রদের পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে ইহা করা বাঞ্ছনীয়।

৪। যদিও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়াই ছাত্রগণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে, শিক্ষক এই জ্ঞানার্জনে তাহাদের সাহায্য করেন। তাহাদের বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতাগুলিকে সংহত করেন তিনি। এইজন্য পুস্তক পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহাও জন্মানোর জন্য তিনি বিদ্যালয়ে প্রকৃত পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন। জ্ঞানার্জনে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তাহাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া তাঁহার প্রধানতম কর্তব্য। ছাত্রমনের আগ্রহ বিবেচনা করিয়া তিনি জ্ঞান বিতরণও করিবেন।

৫। পাঠ্যবিষয় ছাড়াও বিদ্যালয়-সমাজের অন্যান্য কার্যাদির নিয়ন্ত্রণ তিনি করেন। যেমন, বিদ্যালয়ে কোন্ উৎসব প্রতিপালিত হইবে, কি কি খেলা হইবে, কোথায় ভ্রমণে বা বনভোজনে যাওয়া হইবে, অভিনয় ইত্যাদি করিতে কি ব্যবস্থা করিতে হইবে প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাহাকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য ছাত্রদের সহযোগিতায়। এই সব কার্যে তাহাকে সর্বদা বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রাখিতে হয়।

৬। ছাত্রদের নিয়মিত পাঠাগারে পাঠের অভ্যাস করান প্রয়োজন। এইজন্য দৈনন্দিন সময়সূচীতে একটি নির্দিষ্ট সময় রাখিতে হয়, পাঠাগার ব্যবহার করিবার কৌশল শিক্ষা দিতে হয়; উপযুক্ত পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার এবং তাহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার দায়িত্বও শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়।

৭। তাহাকে ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। ছাত্রদের অগ্রগতির মান জানিতে হইলে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। এই সংগে প্রগতিপত্র রচনা ও তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন।

৮। শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলেদের দায়িত্বও তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। শিশুটি কেন অনগ্রসর ইহার কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকার করিবার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়।

৯। অপর সহকর্মীদের প্রতিও তাহার কর্তব্য অপরিসীম।

১০। অভিভাবকদের সংগেও তিনি সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলেন।

সুতরাং দেখা যায় শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। একসময় মনে হইত বেতারযন্ত্র, ছায়াছবি, শিক্ষামূলক প্রচারপত্র ইত্যাদি শিক্ষকের স্থান অনেকখানি অধিকার করিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকেরই মত শিক্ষকের কাজেই শুধু সহায়তা করে। শিক্ষকের নেতৃত্ব ও পরিচালনা না থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। শিক্ষককেন্দ্রিক যুগে তিনি শুধু শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব

প্রধান শিক্ষক মুখ্যতঃ শিক্ষক হইলেও তাহার সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনা প্রয়োজনীয়। শিক্ষক সাধারণতঃ ছাত্রদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, প্রধান শিক্ষক ছাত্র-শিক্ষকসহ সমগ্র বিদ্যালয়-সমাজের নেতা। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই তাঁহার দায়িত্ব সম্প্রসারিত। তিনি এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে না পারিলে সমগ্র বিদ্যালয়-সমাজে গলদ দেখা দেয়।

তাঁহার কর্তব্যগুলিকে মোটামুটি প্রধান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(১) ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য। (২) সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য। (৩) অভিভাবক এবং স্থানীয় জনমণ্ডলীর সহিত কর্তব্য।

১। ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য :

সাধারণতঃ দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের সহিত বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। অপরাপর শিক্ষকের মাধ্যমেই তাহাদের কাজের আদান-প্রদান ঘটে। সাধারণ নীতি ও নিয়মাবলীর প্রণয়ণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কোথাও ছাত্রশিক্ষক সম্বন্ধ আশানুরূপ পরিচালিত না হইলে তিনি সহযোগিতায় অগ্রসর হন। কিন্তু বিদ্যালয়-সমাজের প্রকৃত নেতৃত্ব করিতে হইলে প্রধান শিক্ষককে সকল ছাত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়।

প্রত্যেক ছাত্রের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, তাহাদের মন ও গৃহ পরিবেশ যদি তিনি না জানেন, তবে তাহাদের নেতৃত্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক কোন শ্রেণী বা কয়েকটি শ্রেণীর সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রের সংস্পর্শে আসিতে হয়। এইজন্য এমন ব্যবস্থা

থাকা প্রয়োজন যে প্রত্যেক ছাত্রই তাহাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে জানাইতে পারে, তিনিও কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতেই তাঁহার অধ্যাপনা করা কর্তব্য। তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকেন বলিয়া প্রত্যেক দিন প্রত্যেক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করা হয়তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সপ্তাহে, কি এক পক্ষে অন্ততঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে একবার যাওয়া প্রয়োজন। ইহাতে একদিকে ছাত্রদের সংগে সম্বন্ধ যেমন ঘনিষ্ঠ হয়, অন্যদিকে শিক্ষকদেরও তিনি মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ পাঠনার (model teaching) নিদর্শন দেখাইতে পারেন। অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক উচ্চ শ্রেণীতেই শুধু অধ্যাপনা করেন। কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীতেও তাঁহার যাওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনেও তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনেও প্রধান শিক্ষকের সংগে ছাত্রদের যোগাযোগ থাকা ভাল। আবাসিক বিদ্যালয় হইলে ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। সেখানে তিনি তাহাদের সংগে খেলাধূলাতে যোগ দিতে পারেন। তাহাদের থাকা, খাওয়া, শরীর মনের সুস্থতা, লেখাপড়ার সুবিধা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তাহাকে ব্যবস্থা করিতে হয়। একথা তিনি সর্বদাই মনে রাখেন যে এই সমস্ত ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি, তাহাদের শুভাশুভ সমস্তই তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। এইজন্য ছাত্রদের সংগে তাঁহার সম্বন্ধ হইবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভিত্তিতে, ভয়ের ভিত্তিতে নয়। কোন ছাত্রের প্রতিই তাহার পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। স্নেহ ও ভালবাসা দ্বারাই তিনি তাহাদের মন জয় করিয়া লইতে পারেন এবং এই ভালবাসার প্রভাবেই তিনি তাহাদের চরিত্র গঠন করিতে সক্ষম হন।

২। সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য :

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের সহিত তাঁহার সহকর্মী শিক্ষকদের প্রীতির সম্বন্ধ নাই। ইহার কারণ কি ? দোষত্রুটি উভয় পক্ষেরই থাকে, তবু তুলনা করিলে দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য এই অপ্রীতিকর সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। তিনি সহকর্মী শিক্ষকদের তুলনায় নিজেকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্মান ও প্রতিপত্তিতে অনেক উচ্চে মনে করেন,

এবং ইহার ফলে তিনি যেন বিদ্যালয়ের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া ওঠেন। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মতামতের কোন মূল্য দেন না; বাধ্যতামূলক-ভাবে অনেক কাজে তাঁহাদের প্রবৃত্ত করান, এমন কি নিজেদের অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও তাঁহাদের তিনি স্বাধীনতা দেন না! সহযোগিতার পরিবর্তে সর্বদাই তিনি তাঁহাদের ত্রুটি বাহির করিতে ব্যস্ত থাকেন। অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, কোন শিক্ষক জ্ঞানবুদ্ধি বা ব্যক্তিত্বে শ্রেষ্ঠ হইলে তাহাকে তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। অন্যদিকে সহকর্মী শিক্ষকগণও অনেক স্থলে প্রধান শিক্ষকের সহিত অসহযোগিতা করিয়া থাকেন সত্য, তবু বিদ্যালয়ের শান্ত-সমাহিত পরিবেশকে স্মরণ করিয়া ইহার কল্যাণের জন্য তাহাকেই সহযোগিতা-স্থাপনে অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য কতকগুলি বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন।

(ক) প্রথমতঃ, বিদ্যালয়ের অপরাপর শিক্ষকদের সমগোত্রীয় ছাড়া তিনি আর কিছুই নন, একথা সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি অন্য অপেক্ষা অনেক বেশী দায়িত্ব বহন করেন সত্যিই, তবু তিনিই বিদ্যালয় সমাজের সর্বেসর্বা নন্।

(খ) বিদ্যালয় সমাজের নিয়মকানুনের প্রণয়ণে এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষকদের কাজ ও দায়িত্বের নির্ধারণকালে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

(গ) শিক্ষকদের বিভিন্ন কাজে তিনি কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করিবেন। ইহার ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় ও বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি দিকের কাজেই তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন।

(ঘ) শিক্ষকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। যেমন—শ্রেণীর পাঠনা, শ্রেণীর শৃঙ্খলা-রক্ষা ইত্যাদি। সাধারণ নীতি নির্ধারণের বেশী প্রধান শিক্ষকের অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। অবশ্য অনেক সময়ে আদর্শ পাঠ দিয়া শিক্ষকদের সাহায্য করাও তাহার কর্তব্য। এইজন্য প্রধান শিক্ষককে অন্যান্য শিক্ষকদের অপেক্ষা বিদ্যা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হইতে হয়।

(ঙ) কাজের কৃতিত্ব তিনি নিজে না নিয়া যথাসম্ভব শিক্ষককে দিতে চেষ্টা করিবেন। অপরদিকে উপরস্থ কর্মচারীর নিকট দোষত্রুটীর দায়িত্ব তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বসাধারণের সামনে বিশেষ করিয়া ছাত্রদের সামনে তাহার সহকর্মীদের মর্যাদা কোন অবস্থায় ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে।

(চ) যেখানে কঠোরভাবে নীতিপালন করিতে হয়, সেখানে তিনি অপ্রিয় কর্তব্য করিতে চক্ষুলজ্জা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিবেন না এবং নিজেও কখনও নিয়ম বা নীতি ভাঙ্গিবেন না।

(ছ) প্রত্যেক শিক্ষকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করা প্রয়োজনীয়। তাঁহাদের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেওয়া ও আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। এইজন্য বিদ্যালয় ছাড়াও বাড়ী-যাতায়াতের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবেন।

(জ) তিনি তাঁহাদের কাজের সমালোচনা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা ও উৎসাহ দিবেন। তাহাদের কৃতিত্ব দশজনের সম্মুখে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয়।

(ঝ) অধস্তন কর্মচারীদের সংগেও তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক থাকা উচিত। তাহাদের কাজ সামান্য হইলেও এই গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়-সমাজের তাহারাও সমান অংশীদার।

৩। অভিভাবক ও জনমণ্ডলীর প্রতি কর্তব্য ঃ

(ক) অভিভাবকদের সহিতও ব্যক্তিগত পরিচয় রাখিতে হয়। বিভিন্ন অভিভাবকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে প্রধান শিক্ষককে অনেকখানি ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়। অথচ শিশুর মঙ্গলের জন্য অভিভাবকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অভিভাবকদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষানীতি প্রচার করাও তাঁহার একটি কর্তব্য। এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা, ইহার উদ্দেশ্য, আদর্শ প্রভৃতি লইয়া অভিভাবকদের সহিত আলোচনা করিতে হয় এবং শিশুটির ভালমন্দ নির্ধারণেও তাঁহাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হয়।

(খ) অভিভাবক ছাড়াও বিদ্যালয়ের আঞ্চলিক জনমণ্ডলীর সহিতও প্রধান শিক্ষকের সৌহার্দ থাকা প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়-সংগঠনে তাঁহারা অনেক সহায়তা করিয়া থাকেন। শিক্ষার নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের সচেতন করিয়া না তোলা যায়, তবে সেইখানে বিদ্যালয়-স্থাপন ও উহার প্রতিষ্ঠা কল্পনা করাও বাতুলতা মাত্র। সেই জনমণ্ডলীকে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কুতূহলী ও সচেতন করিতে হইলে বিদ্যালয়ের কর্মপরিষদে তাঁহাদের আহ্বান করিতে হয় এবং বিদ্যালয়ের সংগে সর্বরকম যোগাযোগ রাখিবার সুযোগ দিতে হয়। তাঁহাদের পরামর্শ ইত্যাদিও প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করিতে হয়।

তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিতেও বিদ্যালয়ের উন্নতি ও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রধান শিক্ষককে অনেকখানি উদারতা, ধৈর্য ও চতুরতার পরিচয় দিতে হয়।

ইহা ব্যতীতও প্রধান শিক্ষকের অপর কতকগুলি দায়িত্ব থাকে। তাহা হইল বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ক্ষেত্রে।

(ক) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন খাতাপত্র, যেমন—শিক্ষকের উপস্থিতি ও ছাত্রদের উপস্থিতির খাতা, বিদ্যালয়ের আয়ব্যয়ের হিসাব খাতা, পাঠাগার ও সরঞ্জামাদির হিসাবখাতা, কর্মপরিষদের কার্যবিবরণী, অভিভাবকদের মতামত পুস্তক ইত্যাদি দেখিতে হয়।

(খ) পাঠ্যক্রম, পাঠ্যতালিকা, পুস্তকতালিকা, দৈনন্দিন কর্মসূচী, মাসিক ও বাৎসরিক পরিকল্পনা, উৎসব ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ইত্যাদিও সহকর্মীদের সহযোগিতায় তাহাকেই করিতে হয়। পরীক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের প্রগতিপত্র রাখাও তিনি অন্য সহকর্মীদের সহযোগিতায় করিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি ছাত্রের সমস্ত দিক্ সম্বন্ধে তাহারি অবহিত থাকা উচিত। এইজন্য মাঝে মাঝে তাহাকে শ্রেণীর কাজও দেখিতে হয়।

(গ) কর্মপরিষদের সভা ডাকা, সভার কার্যবিবরণী রাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রাখা, শিক্ষাদপ্তরের সহিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, শিক্ষক, ছাত্রদের এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারীদের অতিরিক্ত ছুটির ব্যবস্থা করা ও হিসাব রাখা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মপরিষদকে সাহায্য করা, ছাত্রের ভর্তি কিংবা স্থানান্তরিত-করণের ব্যবস্থাও তাঁহাকেই ভাবিতে হয়। বিদ্যালয়ে হঠাৎ কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে তিনিই কুশলী হস্তে তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়-সমাজের তিনি পরোক্ষ নায়ক ও ধারক। তাঁহার কর্তব্যকে তাই হিসাবের গণ্ডিতে আনা যায় না।

শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক

শিক্ষকের দায়িত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের মধ্যে কে বাঞ্ছনীয় তাহা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও সকল ছাত্র বিদ্যালয়-সমাজের সভ্য তথাপি ছাত্রদের জ্ঞানের মান

অনুসারে তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পাঠদানের ব্যবস্থার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে শ্রেণী-নির্ধারণে জ্ঞানের মান ভিন্ন ছাত্রদের বয়সের কথাও বিবেচিত হইবে। অপর-দিকে যদিও সকল শিক্ষকেরই বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রদের সম্বন্ধে সাধারণ কর্তব্য রহিয়াছে, তথাপি প্রত্যেক শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বের বিভাগ-সম্বন্ধে বিষয়-শিক্ষক ও শ্রেণী-শিক্ষকের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে।

একজন শিক্ষকের হস্তে একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ ভার থাকা ভাল, না, তিনি একটি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন? শ্রেণী-শিক্ষক হইলে সেই শ্রেণীর মোটামুটি সকল বিষয়ের শিক্ষাদানের এবং শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রেণীর উন্নতি-অবনতি, ভাল-মন্দ সমস্ত বিষয়ের জন্য শ্রেণী-শিক্ষক দায়ী থাকিবেন। একটি শ্রেণী ব্যতীত বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীগুলির জন্য তাঁহার বিশেষ কোন দায়িত্ব থাকিবে না। অন্যদিকে বিষয়-শিক্ষক বিভিন্ন শ্রেণীতে যে কোন একটি বিষয়ের অধ্যাপনা করিবেন এবং সেই বিষয়টি সম্পর্কেই তাহার বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে।

এই দুই ব্যবস্থার ভাল-মন্দ দুই দিকৃই আছে। বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইলে আমাদের সাধারণতঃ তিন দিক্ হইতে বিচার করিতে হইবে—(১) ছাত্রের দিক্, (২) শিক্ষকের দিক্, (৩) বিদ্যালয়-পরিচালনার দিক্।

প্রথমে শ্রেণী-শিক্ষকের কথাই ধরা হউক। শ্রেণী-শিক্ষককে আবার দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়। প্রথমতঃ, যাঁহারা কোন একটি শ্রেণীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রতি বৎসর সেই শ্রেণীর দায়িত্ব তাঁহার থাকে। যেমন—প্রথম শ্রেণীর দায়িত্ব একজন শিক্ষক গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতি বৎসরই প্রথম শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা কোন একটি শ্রেণীর ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই ছাত্রদের সহিত তিনিও শ্রেণী বদল করেন। যেমন—প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিবে, তিনিও তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক হইবেন ও এইভাবে প্রতি-বৎসর তাঁহাদের সংগে তাহার দায়িত্ব নিয়াই থাকিবেন।

শ্রেণী-শিক্ষকের বিষয় আলোচনা করিলে সর্বপ্রথমে ইহার সুবিধার কথাই ধরা যাক।

সুবিধা : ছাত্রের দিকে—

১। গৃহের পরিবেশ হইতে ছাত্রগণ যখন বিদ্যালয়ে আসে, এই অচেনা,

সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে থাকে অপরিসীম ভয়। গৃহে পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয় হইতে আসিয়া সেই নিরাপত্তাই চায় তাহারা; শ্রেণীশিক্ষকের নিকট নিরাপদ আশ্রয় পায় এবং তাঁহাকে অনেকটা পিতার প্রতীক বলিয়া দেখিতে শেখে। তাঁহাদের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব শ্রেণীশিক্ষকের; সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাহারা তাঁহার নিকট নির্ভয় ও নিঃসংকোচ হইতে পারে। (২) শিক্ষকের প্রতি নির্ভরশীল হইলেই তাঁহাকে তাহারা ভালবাসিতে শেখে। শিক্ষকও সর্বদা তাহাদের সংগে থাকেন ও তাহাদের খুঁটিনাটি সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখেন বলিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহশীল হইয়া ওঠেন। এই স্নেহ-ভালবাসার সহজ আদান-প্রদানের ফলে শিশুর শিক্ষা দ্রুত ও সহজ হয়। (৩) একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রই শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই তিনি সমান দৃষ্টি রাখিতে পারেন। পিছিয়ে পড়া (backward) ছেলেদের ইহাতে সুবিধা হয়; কারণ, শ্রেণীশিক্ষক তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করিতে পারেন।

শিক্ষকের দিকে:

(১) একটি শ্রেণীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের মনে 'আমার শ্রেণী' এই বোধ জন্মায় (sense of belongingness)। শ্রেণীর পাঠনা ও পরিচালনায় তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার জন্য তিনি নিষ্ঠার সহিত কাজ করেন।

(২) শিশুশিক্ষা মনস্তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি শিশুর মনকে, তাহার আগ্রহ, শক্তি ও প্রয়োজনকে জানা শিক্ষাদানের বিশেষ সহায়ক। শ্রেণীশিক্ষক সর্বদাই একটি শ্রেণীর সংস্পর্শে থাকেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে শ্রেণীর প্রত্যেক শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়। তাহাদের আগ্রহ, চাহিদা ও ক্ষমতার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাঁহার হয় এবং ইহার ফলে প্রয়োজনমত উপযুক্ত ব্যবস্থার গ্রহণ ও তাহাদের উন্নতি-অবনতির প্রতি লক্ষ্য রাখা অনেক সহজ হয়।

(৩) শ্রেণীশিক্ষক প্রত্যেকটি ছাত্রের সামান্যতম অভাব বা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখেন; ছাত্রদের প্রত্যেক আচার-আচরণের দিকেই তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। তিনি আপন ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসার প্রভাবে ছাত্রদের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতে পারেন। অনুকরণপ্রিয় শিশু সর্বদাই তাঁহাদের প্রিয় ও নির্ভরস্থল ব্যক্তিকে অনুকরণ করিয়া থাকে। এই

দিক্ দিয়া উপযুক্ত শ্রেণীশিক্ষক হইলে তিনি তাঁহার শ্রেণীকে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করিতে পারেন।

(৪) শ্রেণী পাঠনা ও পরিচালনাকে সুন্দর ও প্রণালীসম্মত করিবার যথেষ্ট সুযোগ শ্রেণীশিক্ষকের থাকে। জ্ঞানের ধারক মন যেমন অখণ্ড, জ্ঞানও তেমনি। ঘড়ি ও ঘণ্টার হিসাবে ইহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়া কিংবা গ্রহণ করা কোনটাই সম্ভব নয়। উচ্চ শ্রেণীতে আলাদা করিয়া বিষয়ের শিক্ষা দিলেও, জ্ঞান অখণ্ডরূপেই শিক্ষার্থীর নিকট ধরা পড়ে। জ্ঞানকে অবিভাজ্যরূপে প্রদানের সুযোগ শ্রেণীশিক্ষকের আছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও অবিভাজ্য পাঠ্যসূচী ও শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থাকে তিনি কার্যকরী করিবার সুযোগ পান।

(৫) শিক্ষকঅভিভাবক সম্মেলনও শ্রেণীশিককের জন্য সার্থক হইতে পারে। তাঁহার শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রের সম্বন্ধে তিনি জানেন। সুতরাং অভিভাবকদের সংগে যোগাযোগ রাখা তাহার পক্ষে সুবিধা।

বিদ্যালয়ের দিক্ :

প্রত্যেক শ্রেণীর দায়িত্ব একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে না থাকিয়া বিভিন্ন শিক্ষকের হস্তে থাকা গণতন্ত্রসম্মত। প্রধান শিক্ষকের হস্তে সমস্ত বিদ্যালয়ের ভার থাকিলে অন্যান্য শিক্ষকদের স্বাধীনতা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন শিক্ষকের হস্তে কাজের দায়িত্ব থাকার জন্য তিনিও নিষ্ঠার সহিত সেই দায়িত্ব-পালনে তৎপর হন। ইহাতে বিদ্যালয়-পরিচালনা সুষ্ঠু হয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়িয়া ওঠে।

অসুবিধা, ছাত্রের দিকে :

(১) শ্রেণীশিক্ষকের তত্ত্বধানে থাকার ফলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের সাধারণ সমাজ-জীবন হইতে যেন অনেকটা দূরে সরিয়া আসে। শ্রেণীর শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষকদের সহিত তাঁহাদের সংযোগ থাকে না। অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, শ্রেণীশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে কোন সময়ে অপর কোন শিক্ষক শ্রেণীতে গেলে তাঁহারা খুশী হয় না; সেই শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শ্রেণীতে পাঠদান করা একরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

(২) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাব ছাত্রের উপর যথেষ্ট কাজ করে। এই ক্ষেত্রে একই শিক্ষকের পরিচালনা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠনকে

সংকীর্ণ করিতে পারে। শিক্ষকের গুণগুলির সংগে সংগে তাহার দোষ-ত্রুটিগুলিও তাহারা আয়ত্ত করে। তাহাদের সম্মুখে বিভিন্ন জ্ঞান ও চরিত্রের সমাবেশ থাকা ভাল। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে থাকিলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার হয়। শ্রেণীর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া বিদ্যালয়-সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ হইয়া ওঠে।

(৩) যদিও শিক্ষকদের পক্ষপাতদোষ কিংবা বিশেষ পছন্দ-অপছন্দ থাকা উচিত নয়, তবুও একজন মানুষ হিসাবে ইহা থাকা অসম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে যদি কোন ছাত্র শ্রেণীশিক্ষকের অপ্রিয়ভাজন হয়, তবে তিনি স্বভাবতঃই তাহাকে অবহেলা করিবেন। ইহাতে তাহার শিক্ষাজীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

শিক্ষকের দিক্ঃ

(১) একজন শিক্ষকের পক্ষে সমস্ত বিষয়গুলি পড়ান সম্ভব না হইতেও পারে। উচ্চ বিদ্যালয়ে তো ইহা সম্ভব নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এই অসুবিধা দেখা দিতে পারে। নিম্নশ্রেণী হইলেও শিক্ষকের সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অবশ্য আমরা আশা করি একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার মত বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকিবে।

(২) অনেক সময়ে দেখা যায় শ্রেণীশিক্ষক নিজের শ্রেণীসম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন। অপরাপর শ্রেণীর সংগে তিনি নিজের শ্রেণীর তুলনা করেন এবং শ্রেণীর দোষ-ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেন না। ইহার ফলে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, শিক্ষকে শিক্ষকে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর সংস্পর্শে আসিবার ফলে মনের প্রফুল্লতা ও সজীবতা নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) দিনের পর দিন একই শ্রেণীতে পাঠ দিতে শিক্ষকের একঘেয়ে লাগে।

বিদ্যালয়ের দিক্ঃ

শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিতে পারে। ইহার ফলে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য দেখা দিয়া এই বিদ্যালয়-সমাজের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

বিষয়-শিক্ষক থাকার সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা : ছাত্রের দিক্ :

(১) বিষয় শিক্ষক নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লইয়া উপস্থিত হন এবং ইহাতে ছাত্রদের মনে সহজেই অনুরাগ জন্মাইতে সক্ষম হন।

(২) বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসায় তাহাদের মনের প্রসারতা ঘটে।

(৩) কোন এক শিক্ষকের নিকটে অবহেলিত হইলেও অপর শিক্ষকের নিকটে স্নেহ ও আদর পাইবার আশা থাকে।

শিক্ষকের দিক্ :

(১) যে বিষয়ে তিনি আগ্রহসম্পন্ন তাহাই অধ্যাপনা করিবার সুযোগ পান। ইহাতে তাঁহার আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং বিষয়বস্তুকে সরস ও কৌতূহলোদ্দীপক করিতে চেষ্টা করেন।

(২) এক বিষয় লইয়া চর্চা করার ফলে সেই বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার আরও সুযোগ পান।

(৩) বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর সহিতই তাঁহার যোগাযোগ থাকে। ইহাতে বিদ্যালয়ের প্রতিই তাঁহার দায়িত্ববোধ প্রবল হয়।

বিদ্যালয়ের দিক্ :

(১) প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়গুলির দায়িত্ব বিষয়-শিক্ষককে দিয়া অনেকখানি নিশ্চিন্ত হন।

(২) বিদ্যালয়ের সকল কাজেই প্রত্যেকের দায়িত্ব থাকার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়। যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ পরামর্শ করিয়া কাজ করেন।

অসুবিধা : ছাত্রের দিক্ :

শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক আসিবার ফলে ছাত্রগণ মানসিক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁহাদের মনের নিরাপত্তাবোধ ব্যাহত হয়। এইজন্য বিদ্যালয়-সম্বন্ধে ভীতি জন্মে। (২) চরিত্রগঠনে বিভিন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসিবার যেমন মূল্য আছে, ইহার অসুবিধাও আছে। বিভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া

তাহারা কাহাকে অনুকরণ করিবে বুঝিতে পারে না। অনেক সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, কোন শিক্ষক অপর শিক্ষক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেছেন। কিংবা কোন কার্য-পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন একরূপ আদেশ করেন, অপরজন আবার অন্যরকম আদেশ করেন। এই বিভিন্ন মত ও মন্তব্যের জালে পড়িয়া শিশুছাত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনেক সময়েই তাহাদের চরিত্র দৃঢ় হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষকই নিজের বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁহারা এমন কথাও বলেন "অন্য পড়া হউক না হউক, আমার পড়া তৈরী করিয়া দিতেই হইবে।" ইহাতে যে শিক্ষক কোপন স্বভাব হন এবং নানারূপ কঠিন শাস্তি দেন, তাঁহার বিষয়টিই ছাত্রগণ ভীতিবশতঃ প্রস্তুত করিয়া আসে, অন্যান্য বিষয়গুলি অবহেলিত হয়।

শিক্ষকের দিক্ঃ

বিষয় শিক্ষকের একটি বিষয়ের দায়িত্ব থাকে এবং তিনি সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকেন। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন; অন্যান্য বিষয়-সম্পর্কে তাঁহার কোন দায়িত্বই থাকে না। ছাত্রের কোন একটি বিষয়ের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। ছাত্রের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আনুভূতিক, সামাজিক—এই বিভিন্ন দিকের দায়িত্বই শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বিষয় শিক্ষকের দ্বারা এই দায়িত্ব-পালনের সম্ভাবনা কম। 'নানা মুনির নানা মত'-এর চাপে ছাত্রগণ ব্যতিব্যস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে; অনেক সময়ে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'—এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ছাত্র-সম্বন্ধে প্রত্যেক শিক্ষকের দায়িত্ব থাকার ফলে অপরে করিবে ইহা মনে করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকে।

(২) সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রথম যিনি শ্রেণীতে যান তাঁহার উপরই শ্রেণীর দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তাহাকে 'শ্রেণীশিক্ষক' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীশিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ, তিনি শুধু ৪০ মিনিটের জন্য শ্রেণীতে পড়ান। ইহার দ্বারা প্রত্যেকটি ছাত্রকে সম্পূর্ণভাবে জানার সুযোগ হয় না।

(৩) ঘড়ি-ঘণ্টা হিসাবে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যসূচী পরিচালিত হয়। এক একঘণ্টাতে এক একজন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ দিতে যান। ইহাতে একটি বিষয়ের সংগে অপর বিষয়ের কোন সংযোগ থাকে না। ঘণ্টার সংগে সংগে

একজন শিক্ষকের পরিবর্তে অন্য শিক্ষকের আগমন ছাত্রের মনে যেমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে শিক্ষকের পক্ষেও অসুবিধা হয়। ঘণ্টা পড়িবার সংগে সংগে তাহাকে শ্রেণী ছাড়িয়া দিতে হয়, হয়তো তখনও তাহার পাঠ দেওয়া শেষ হয় না ; কিংবা ছাত্রগণ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় ঘণ্টা পড়িল ; ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহই ব্যাহত হয়। কোন বিশেষ কার্যকে কেন্দ্র করিয়া অনুবন্ধ-প্রণালীতে পাঠদান বিষয়-শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রায়ই সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের দিক্ :

বিষয়-শিক্ষকদের হস্তে শুধুমাত্র বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়গুলির শিক্ষাদানের ভার থাকে। ইহার বেশী আর কোন দায়িত্ব তাঁহারা সহজে গ্রহণ করেন না। ইহার ফলে প্রধান শিক্ষকের উপরই বিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। এই পরিচালনা গণতন্ত্রসম্মত হয় না।

শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক থাকার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তেই পৌছাইতে পারি যে, কোন বিষয়ে চরম কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভাল নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত ও প্রণালীসম্মত করিতে আমরা দুইরূপ ব্যবস্থারই সুবিধাকে গ্রহণ করিব। এইদিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সকল সংস্কারমুক্ত ও উদার করা প্রয়োজন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে যে-কোন সময়ই আমাদের শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতিকে পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে একই বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক উভয়ই থাকিতে পারে। তবুও সাধারণভাবে দেখা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী-শিক্ষক থাকা সম্ভব হয় না। উচ্চ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ের বিশদ্ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞান দান করা একজন শিক্ষকের পক্ষে হয়তো সম্ভব হয় না। এইজন্য বিষয়-শিক্ষকের প্রয়োজন। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন বিশেষ শ্রেণীশিক্ষক নির্দিষ্ট থাকিতে পারেন। তিনি মোটামুটি বিষয়গুলি ও ছাত্রের অন্যান্য দিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং বিশেষ বিষয়ের দায়িত্ব শুধু বিষয় শিক্ষক গ্রহণ করিবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক থাকাই হয়ত ভাল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বয়সের শিশু আসে তাহাদের মানসিক নিরাপত্তা ও বিকাশের জন্য শ্রেণী-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানই প্রয়োজন। এই বয়সে তাহাদের শিক্ষা পাঠ্য-পুস্তকের

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সময়ে তাহারা বিভিন্ন খেলা ও কর্মের ভিত্তিতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অবিভাজ্যতার নীতিতে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। শিক্ষক শুধু তাহাদের উপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন ও বাস্তব জীবনে তাহার ব্যবহার করিতে সাহায্য করেন। সুতরাং এই শিশু শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করিতে যেটুকু বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, আমরা আশা করি প্রাথমিক শিক্ষক সেই জ্ঞান লইয়াই আসেন। তবে গান বা হাতের কাজ হয়তো সকল শিক্ষক নিপুণভাবে না জানিতে পারেন; এইজন্য বিশেষ শিক্ষক তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

শ্রেণীশিক্ষক থাকার একঘেয়েমী দূর করার কথাও আমাদের চিন্তা করিতে হয়। পূর্বে আমরা দ্বিতীয়রূপ শ্রেণীশিক্ষকের যে আলোচনা করিয়াছি সেইরূপ শ্রেণীশিক্ষক না থাকাই ভাল। ঐরূপ শ্রেণীশিক্ষকের ব্যবস্থা থাকিলে ছাত্র ও শিক্ষকের উভয়েরই মন ও দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হইয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রেণীশিক্ষকের একঘেয়েমী দূর করা সম্ভব হয়, যদি কয়েক বছর অন্তর শ্রেণী পরিবর্তন করা যায়। যেমন, দুই বছর পরে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণীর ভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে শিক্ষকদের একঘেয়েমীও যেমন দূর হইবে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত শিক্ষকদের পরিচয় ও সংযোগ ঘটিবে; অন্যদিকে প্রত্যেক শ্রেণীতেই পাঠদানের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা তাঁহারা অর্জন করিবেন। এইভাবে শ্রেণীশিক্ষক থাকায় অসুবিধাগুলিও আংশিকভাবে দূর করা সম্ভব হইতে পারে।

শিক্ষকের গুণাবলী ঃ

শিক্ষকের কর্তব্যের কথা মনে করিলেই তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মায়। ইহা ব্যতীতও ছাত্রগণ শিক্ষককে কিরূপ দেখিতে চায় তাহা বিচার করাও হয়ত কর্তব্য। ইহা লইয়া আমাদের দেশে কিছু গবেষণাও হইয়াছে। ছাত্রদিগকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহারা শিক্ষকের কি কি গুণ পছন্দ করে? তাহাদের উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া মোটামুটিভাবে জানা গিয়াছে যে—

(১) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা দরকার।

(২) পাঠদানে তাঁহার দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) তাঁহার মন ছাত্রদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবে।

(৪) তিনি ছাত্রদের সংগে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিবেন।

শিক্ষকের কর্তব্য ও ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে চিন্তা করিলে শিক্ষকের গুণাবলীকে মোটামুটি দুইটি ভাগ করা যায়। (ক) জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা; (খ) চারিত্রিক গুণ।

(ক) জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা: বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় অন্ততঃ দুইটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বিষয়-শিক্ষক হইলেও বিদ্যালয়ে অন্য বিষয়ও তাঁহাকে পড়াইতে হইবে—এই আশা করা অন্যায় নয়। বর্তমান জগতের সংগে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিষয়বস্তুর আধুনিক জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। জগৎ পরিবর্তনশীল—শিক্ষারও পরিবর্তন হয়। তাই শিক্ষককে সর্বদাই জ্ঞানের প্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইবে।

(২) শিক্ষকেরও জগতের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টি উদার হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ছাত্রদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে এবং তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল হইবে। যে ব্যক্তির নিজের কোন জিজ্ঞাসা নাই, সে কখনও প্রকৃত শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী হইতে পারে না। সুশিক্ষক আমৃত্যু শিক্ষার্থীই থাকিয়া যান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে দীপ নিজে জ্বলে না, সে অপরকে জ্বালাইতে পারে না।

(৩) জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সহিত তিনি সুপরিচিত হইবেন এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন। জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সহিত ছাত্রদের পরিচয় না ঘটাইতে পারিলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

(৪) শিশুমনস্তত্ত্বে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জানা না থাকিলে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যথোপযুক্ত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন করা সম্ভব হইতে পারে না।

(৫) শিক্ষাদানের পদ্ধতি-সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। শিক্ষার মূলতত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে শিক্ষাদানের কার্য কখনই সফল হইতে পারে না।

(৬) বিদ্যালয়ের সামাজিক-জীবন ও Co-curricular activities

পরিচালনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁহার থাকা প্রয়োজনীয় এবং ছাত্রদের সহিত অংশগ্রহণের যোগ্যতা থাকাও প্রয়োজনীয়।

চারিত্রিক গুণ :

(১) শিক্ষক জাতির গুরু এবং পথপ্রদর্শক—প্রকৃত শিক্ষক ইহা কখনই বিস্মৃত হন না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদান কার্যকে জীবনের ধ্যান ও জ্ঞানের সহিত অভেদ করিয়া না লইতে পারিলে উপযুক্ত শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষকের চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যে পবিত্রতা থাকিবে এবং শিক্ষাদান-কার্যে থাকিবে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন। প্রবাদ আছে—আমরা যাহা চাই, তাহাই পাইতে পারি—তবে সেই প্রার্থিত বস্তুর জন্য মনে থাকা চাই ঐকান্তিক আগ্রহ। জীবনে সাফল্য-লাভের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে এই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়শক্তি শিক্ষককেই সম্প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। তাঁহার আদর্শ জীবন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিবে, উদ্বুদ্ধ করিবে।

(২) শিক্ষকের নিজ জীবনদর্শন থাকা চাই। ইহা ব্যতীত তাহার চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা সম্ভব নহে। ন্যায়, নীতি, সত্য ও ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৩) প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষকতাকে অর্থ, নাম, যশ—ইহার কোন একটির ধারকরূপেই গ্রহণ করে না। মানুষের প্রতি প্রীতি ও প্রেমই তাঁহাকে এই বৃত্তি-গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। অর্থ, নাম কিংবা যশের লোভ যখন তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তিনি শিক্ষকের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। কাজেই তাঁহাকে আদর্শবাদী হওয়া আবশ্যক এবং শিক্ষকতাকে তিনি জীবনে অনেকটা ব্রতের মত গ্রহণ করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি তাঁহার অনুকূল মনোভাব থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ এরূপ, যেমন পূর্বপুরুষের সহিত উত্তরাধিকারীর। এইজন্য তিনি তাঁহার প্রখর ব্যক্তিত্বে, দীপ্তিময়ী বুদ্ধিতে, সদাচার ও সপ্রেম ব্যবহারে অনুবর্তীজনকে আকৃষ্ট করিবেন ; ভবিষ্যৎ জীবনের পথ অতিক্রম করিতে সহায়তা করিবেন। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছিল এই সম্বন্ধ—গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। গুরু ছিল শিক্ষার্থীর নমস্য, পিতৃতুল্য। তখন হৃদয়ের সম্বন্ধ ছিল গভীর। শিক্ষার্থী গুরুর জ্ঞানগরিমার সংগে সংগে তাঁহার চারিত্রিক সম্পদেরও উত্তরাধিকারী হইত। প্রকৃত শিক্ষকের

ইহাই তপস্যা। তবে তাঁহাকে অন্ধের মত অনুকরণ করিতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিবেন না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্বে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী ও অনুকরণ প্রিয় হইলে, অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর জটিল চিত্তও পরনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ

"Worship your Guru as God, but do not obey him blindly. Love him all you will, but think for yourself."

(৫) সুশিক্ষক স্বভাবতঃই সৌম্য, সুস্থ, সবল, অবিকলাঙ্গ, কষ্টসহিষ্ণু, এবং তীক্ষ্ণধী ও স্মৃতিসম্পন্ন হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনা, পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিচার ও যুক্তি থাকা প্রয়োজনীয়, তাঁহার স্বভাব স্থির ও ধীর থাকা প্রয়োজনীয়। তিনি শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহশীল, দয়াবান্, প্রফুল্লচিত্ত, সরল, সংযত ও ভদ্র হইবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তাহার নিকট সমান স্নেহ ও সাহায্য পাইবে—কাহারও প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। অহংকার, আত্মম্ভরিতা থাকা কখনই উচিত নয়। মৌলিকতা ও অবস্থা-আয়ত্তীকরণ-ক্ষমতা শিক্ষকের বিশেষ গুণ।

(৬) সুশিক্ষকের শিশুসুলভ মনটি কখনই বিনষ্ট হয় না। যাঁহার অন্তরে শিশুসুলভ ভাবটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনি কখনই শিশু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে পারেন না ; কারণ, তিনি তাহাদের বুঝিতে পারেন না—ইহা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষক এই বিভিন্ন গুণের অধিকারী হইয়া জনচিত্ত জয় করিতে সক্ষম হন এবং জাতি ও সমাজকে শিক্ষার পথে, অগ্রগতির পথে লইয়া চলেন।

অভিভাবক ও শিক্ষক সম্মেলন

আমাদের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই আমরা কিছু-না-কিছু শিখিয়া থাকি। আমাদের এই অভিজ্ঞতাগুলি যদি পরস্পর-বিরোধী হয়, তাহা শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিতে পারে। দুইটি বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা চরিত্রের সংহতি ও দৃঢ়তা নষ্ট করে এবং অনেকক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর এই অভিজ্ঞতাগুলি যদি একটি অপরের পরিপোষক হয়, তবে শিক্ষা সহজ ও সবল হইতে পারে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি মোটামুটি পরিকল্পিত থাকে। শিক্ষকের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ

করিয়া ছাত্রগণ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে ও ইহা দ্বারাই শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা, ছাত্রের অভিজ্ঞতা সমষ্টির অংশমাত্র। অধিকাংশ সময়ই তাহার বিদ্যালয়ের বাহিরে, গৃহে এবং অন্যান্য পরিবেশে অতিবাহিত হয়।) এখানেও শিশু বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে। (শিশুর শিক্ষার সর্বপ্রথম স্থান গৃহ এবং শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক তাহার মাতা। গৃহের পরিবেশ গভীর ভালবাসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে তাহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাহা তাহাদের বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।) বিশেষ করিয়া শৈশবে তাহারা মা-বাবা, দাদা, দিদি প্রভৃতি ভালবাসার জনদের অনুকরণ করিতে চায়। পরিবারের সুন্দর পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের চরিত্র, অভ্যাস, নৈতিক গুণাবলী ইত্যাদি বিশেষ এক পারিবারিক ছাঁচে গড়িয়া ওঠে। যে পরিবারে শান্তি নাই, সম্প্রীতি নাই, যেখানে অভিভাবক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেন কিংবা চরিত্রগত দুর্বলতা প্রকাশ করেন—সেই পরিবারের শিশুদের উপর ইহা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও তাহাদের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই—(শিশুর শিক্ষা-জীবনে গৃহ বা পরিবার বিদ্যালয় অপেক্ষাও অধিক কার্য করিয়া থাকে।)

গৃহ এবং বিদ্যালয় এই উভয় পরিবেশই যখন শিশুর শিক্ষায় সমান অংশ গ্রহণ করে, শিশুকে সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা দিতে হইলে এই দুই পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত হইলে চলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—বিদ্যালয়ে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে গৃহে ঠিক তাহার বিপরীত শিক্ষা পায়।) যেমন, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গঠনের জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা সাফাই করান হয়। মাঝে মাঝে তাহাদের বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বও পরিষ্কার করিতে হয়। এই অভ্যাসগঠন তখনই সম্ভব যদি গৃহেও সাফাইকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। আর যদি কোন মাতাপিতা তাহার সন্তান নোংরা বা আবর্জনা পরিষ্কার করুক তাহা না চান, তবে এই অভ্যাস সেই শিশুটির কখনই গড়িয়া উঠিবে না; (উপরন্তু দুই বিপরীত-ধর্মী শিক্ষার ফলে তাহার জীবনে জটিলতা দেখা দিবে।) ইহা তো একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। গৃহ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য, এরূপ অসহযোগিতা প্রতিনিয়তই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা ভুলিয়া যাই যে শিশু আপন জীবনের ভিতর দিয়াই শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহার

জীবনকে যেমন খণ্ডিত করা যায় না, তেমনি তাহার শিক্ষাকেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষায় ভাগ করা যায় না। এই দুই শিক্ষাই এক এবং অবিভাজ্য। সুতরাং গৃহ এবং বিদ্যালয়ের সংযোগ ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।)

বাস্তবক্ষেত্রেও শিক্ষাদান-কার্যে শিক্ষককে সব সময়েই পরিবারের কথা স্মরণ করিতে হয়। অনেক সময়েই দেখা যায়—ছাত্রদের সমস্যামূলক ব্যবহারের অধিকাংশেরই উৎপত্তি-স্থল তাহাদের গৃহ। এইজন্যও তাহাদের পারিবারিক ইতিহাস শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। শিশুর মাতাপিতা ও শিক্ষক উভয়েই তাহাদের মঙ্গলকামনা করেন; তবু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নাই। প্রায়ই দেখা যায়—পরস্পরের সম্বন্ধ সমালোচনার ও তিক্ততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—অভিভাবক ও শিক্ষক, উভয়ের দিক্ হইতেই যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। শিক্ষকের পক্ষ হইতে অভিভাবকের সহিত আদর্শ সম্বন্ধ স্থাপনের বাধাগুলি এইরূপ:

(১) সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই মাতাপিতা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের দায়িত্ব শেষ করেন। অথচ একা শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা যে সম্ভব নয়, এ সম্পর্কে তাহাদেরও যে সমান দায়িত্ব আছে, এ বিষয়ে চিন্তা করেন না। অন্যদিকে শিক্ষার ত্রুটি হইলে নিজেদের ত্রুটির কথা ভুলিয়া সম্পূর্ণ দোষই শিক্ষকের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্বন্ধ তিক্ততরই হইয়া ওঠে। ছাত্রদের সম্বন্ধে কোন আলোচনার উদ্দেশ্যে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাইলে অনেকেই আসেন না, এবং যাঁহারা আসেন তাঁহারা সাধারণতঃ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া আসেন না, সমালোচনা করিতেই আসেন—ইহাই শিক্ষক জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা।

(২) শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজ এবং ব্যক্তিগত কাজ লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে, অভিভাবকদের সহিত বাড়ীতে গিয়া সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অবসর পান না। বড় শহর বা নগরীতে শিক্ষক ও অভিভাবক তো সম্পূর্ণ অপরিচিতই থাকিয়া যান। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাতে শিক্ষক অভিভাবকদের সমপর্যায়ে থাকেন না বলিয়াও অনেক সময়ে পারস্পরিক সম্বন্ধ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৩) সমাজ-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই হউক বা যে-কোন কারণেই

হউক, শিক্ষক তাহার অধিকার একান্তভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। বিদ্যালয়-সম্পর্কে অপরের মতামত বা পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে চান না। শিক্ষাব্যাপারে নিজেকে তিনি বিশেষভাবে অভিজ্ঞ মনে করেন এবং এইদিকে অভিভাবকদের সম্বন্ধে তাহার ধারণা করুণা ও অবজ্ঞা মিশ্রিতই হইয়া থাকে।

(৪) শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিক্ষার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অভিভাবকদের তেমন পরিষ্কার ধারণা থাকে না বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা শিক্ষককে নিজেদের পারিবারিক খবরাখবর দিবার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহাকে আপত্তিকর মনে করেন। অনেক সময়ে আবার কোন পারিবারের আদরের সন্তানকে বিদ্যালয়ে শাস্তি দিলে অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হন এবং ছাত্রদের সম্মুখেই শিক্ষকের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ তলব করিতেও দেখা যায়। ইহার ফল যে কত বিষময় হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সমস্ত কারণেই অভিভাবকদের সহিত শিক্ষকগণ সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন না।

কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা থাকিলেও শিশুর মঙ্গলের জন্যই শিক্ষক ও অভিভাবকের পারস্পরিক সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক। তাহা সম্ভব না হইলে শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হইতে পারিবে না। শিক্ষা-জগতের সংগে অভিভাবকের তেমন সংযোগ থাকে না। শিক্ষক এই জগতের বাসিন্দা এবং সংসারে জ্ঞানবর্তিকা হাতে লইয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইদিক্ হইতে শিক্ষকের কর্ম এবং কর্মপালনের দায়িত্ব অনেক মহান্। সুতরাং অভিভাবকদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বা অসহযোগিতার কথা স্মরণ রাখিলে শিক্ষকের কাজ অগ্রসর হইতে পারে না। শিক্ষককেই সমস্ত রকম বাধা ও অসুবিধা অপসারণের উপায় খুঁজিতে হইবে; তাঁহাকেই অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং অভিভাবক ও শিক্ষক সম্মেলনকে সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকের অনেকখানি কর্তব্য আছে।

(১) বিদ্যালয়ের কাজে অভিভাবকদের সহযোগিতার সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে শিক্ষকের মনোভাবের পরিবর্তন করিতে হইবে। অনেক অভিভাবকই হয়তো সন্তানের লেখাপড়া সম্পর্কে উদাসীন থাকেন—বিদ্যালয়ের উপর দায়িত্ব দিয়াই নিশ্চিন্ত হন; আবার অনেক অভিভাবকই অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ব্যাপারে সন্তানকে কোনরূপ সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। তবু শিক্ষক মনে রাখিবেন যে, শিক্ষাকার্য সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইহাদের সকলের সহযোগিতাই

অপরিহার্য। অশিক্ষিত হইলেও মাতাপিতা শিশুর জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। অপরদিকে কোন অভিভাবক বিদ্যা, অর্থ ও প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি মনে হীনতাবোধকে প্রশ্রয় দিবেন না। তাঁহার সহযোগিতা ভিন্ন অভিভাবকদের পক্ষে সন্তান মানুষ করা সম্ভব নহে। তাঁহার প্রত্যেক অভিভাবককেই সহযোগী বন্ধু মনে করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন অভিভাবককে শিক্ষক অবহেলা করেন, আবার কাহারও নিকট হইতে নিজেকে হীনতাবোধের জন্য দূরে সরাইয়া রাখেন। অনেক শিক্ষক আশা করেন বিদ্যালয়ে তিনি যে পাঠ দিবেন গৃহে অভিভাবক স্বয়ং অথবা গৃহশিক্ষকের দ্বারা সেই পাঠ প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। ইহা না হইলে শ্রেণীতে ছাত্রের নিকট তিনি অভিভাবক সম্বন্ধে অনেক সময়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ছাত্রের মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষকের অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ মধুর হয় না।

(২) অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়। হয়তো তাহারা সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না, কিন্তু ছাত্রের প্রগতি-পত্র-সম্বন্ধে বা অন্যান্য বিষয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের দ্বারা শিক্ষক অবশ্যই অভিভাবকদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবেন। ছেলেদের শরীর, মন, চরিত্র, সদভ্যাস, বিশেষ কোন গুণ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই শিক্ষক নজর রাখেন এবং ইহার উন্নতি অবনতি সম্পর্কে সর্বদাই অভিভাবককে জানানো প্রয়োজনীয়। প্রগতিপত্রের দ্বারাই সাধারণতঃ তাহা করা হইয়া থাকে। তাই প্রগতিপত্র শুধুমাত্র জ্ঞানমুখী বিষয়ের পরীক্ষার নম্বরের ফিরিস্তি না হইয়া ইহাতে ছাত্রের সমস্ত দিকের অবনতি বা উন্নতির বিবরণ থাকা দরকার। এই প্রগতিপত্র বৎসরে অন্ততঃ চারবার অভিভাবকের জ্ঞাতার্থে পাঠানো আবশ্যক। ইহা দ্বারা কোন্ দিকে ছেলের কি অসুবিধা আছে তাহা তিনি জানিতে পারেন এবং সেই সম্পর্কে শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন।

(৩) এই প্রগতিপত্র সম্বন্ধে অভিভাবকদের সংগে যে-কোন সময়ে আলোচনার জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকিতে হয়। মাঝে মাঝে এই সম্পর্কে অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলন হওয়া উচিত। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হইবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের পারস্পরিক পরিচয় ও সহযোগিতা স্থাপন। তাহারা ছাত্রের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করিবেন। ইহা ব্যতীতও বৎসরে অন্ততঃ দুইবার মাতৃ

বা পিতৃদিবস (parent's day) উদ্‌যাপন করা প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য প্রথমতঃ (১) শিক্ষকের সংগে মাতাপিতার সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন; (২) বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজের সংগে অভিভাবকদের যথাসম্ভব পরিচয় করান; (৩) বিদ্যালয়ের কার্য ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ দেখিয়া এবং শিক্ষকের সংগে আলোচনা দ্বারা অভিভাবকগণ শিশুমনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানলাভ করিবেন। ইহা ব্যতীত নিজেদের সন্তানদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিবেন।

কিভাবে শিক্ষক অগ্রসর হইবেন

পূর্বেই বলা হইয়াছে অভিভাবকদের সংগে সহযোগিতা করা সব ক্ষেত্রে সহজ না হইলেও শিক্ষককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বিভিন্ন অভিভাবকগণ ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; হয়তো শিক্ষকদের অনেক বিরূপ মন্তব্য ও কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে, তবু তাহাদেরই এই কাজে অগ্রণী হইতে হইবে। অভিভাবকদের সংগে সংযোগের জন্য তাহারা কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন:

(১) এমন কোন ক্লাব বা সংঘ থাকা ভাল যেখানে শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ মিলিতভাবে খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ করা ও মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার মধ্যদিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা অনেকখানি স্থাপন হয়।

(২) বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থান থাকা প্রয়োজন। তাহা ব্যতীতও প্রত্যেক অভিভাবক যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ে আসিতে পারেন, শিক্ষকদের সংগে আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের এজন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা দরকার। পরীক্ষার পরে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সময়ে অভিভাবকদের আলোচনার জন্য ডাকা প্রয়োজনীয়।

(৩) অভিভাবকদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয়। প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ ভাল ছেলেদের হাতের কাজ স্থান পায়। তাহা সমীচীন নয়; এই প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের কাজের স্থান থাকিবে; ইহাতে ছাত্রগণও উৎসাহ পাইবে এবং আপন আপন অভিভাবককে নিজেরাই প্রদর্শনীতে টানিয়া আনিবে। ছাত্রদের বিভিন্ন কাজ

ব্যতীতও এই প্রদর্শনীতে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানদানের ব্যবস্থাদি থাকা প্রয়োজনীয়।

(৪) ছাত্রগণ অভিনয় ইত্যাদি প্রদর্শনের দ্বারা শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিকট তাহাদের বিভিন্ন গুণের প্রকাশ করিবে। ইহাতেও কয়েকটি বিশেষ ছাত্রকে সুযোগ না দিয়া যত অধিক সংখ্যক ছাত্রকে সম্ভব সুযোগ দেওয়া আবশ্যক।

(৫) ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের মিলিত আলোচনা-সভা ও বিতর্ক-সভা থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

(৬) বিদ্যালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আগ্রহের প্রতিও নজর রাখিতে হইবে। যেমন, খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদি। ইহাতে অনেক অভিভাবকই সাধারণ আগ্রহের বশে যোগ দিবেন আশা করা যায়।

(৭) অনুষ্ঠান-লিপিতে অভিভাবকদের অংশ গ্রহণেরও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয়।

(৮) অবসর সময়ে বিদ্যালয়কে অভিভাবকদের কাজের জন্য ব্যবহার করিতে দিলে ইহার সহিত তাঁহারা ঘনিষ্ঠতা রাখিবেন। বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র বা জনশিক্ষা কেন্দ্রগুলি বিদ্যালয়ে হওয়াই ভাল।

(৯) বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে অভিভাবকদের রচনা ইত্যাদির স্থান থাকা ভাল।

এইভাবে শিশুর দুই সমাজ-জীবন, বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শের সার্থক রূপায়ন সম্ভব হইতে পারে।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান কোথায়? আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের মতে 'শিশু নিজেই তাহার শিক্ষক' এই মতকে সমর্থন করিলে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কি?

২। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকের মধ্যে তফাৎ কি? বিদ্যালয়ে শ্রেণীশিক্ষক এবং বিষয়-শিক্ষকের মধ্যে কোন্ শিক্ষক থাকা ভাল, আলোচনা করুন।

৪। সুশিক্ষকের কি কি গুণাবলী থাকা উচিত?

৫। শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের মধ্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য কোন্ প্রকার শিক্ষকের প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন? আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

৬। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। কি কি গুণ থাকিলে প্রধান শিক্ষক হওয়া সম্ভব বলিয়া আপনি মনে করেন?

৭। বিদ্যালয়-পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন নীতি ও পদ্ধতিকে প্রধান শিক্ষক গ্রহণ করেন?

৮। অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা কি? কিভাবে অভিভাবকদের সহযোগিতা পাওয়া যায়?

৯। অভিভাবক ও শিক্ষকের সম্মেলন সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা-ব্যবস্থা

"Many educators agree in theory that a single crucial examination does not provide the best test of a person's ability. Many of them have even passed from theory to practice and are giving up the single crucial examination in favour of a series of periodical tests of knowledge and intelligence and the reports, over a span of years, of teachers and inspectors."

—*Mr. Aldous Huxley.*

পরীক্ষা-গ্রহণ ও ইহার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন মিটাইবার ভার বিদ্যালয়ের উপরই পড়িয়াছে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিদ্যালয়কে ধারাবাহিক-ভাবে চেষ্টা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে এবং চারিত্রিক উন্নতিতে সাহায্য করা এবং তাহার পরিমাপ করার দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করিতে হয়। ছাত্র ও শিক্ষকের প্রথম মিলনেই প্রত্যেকটি ছাত্র সম্বন্ধে শিক্ষককে জানিতে হয়; আবার শিক্ষাদানের পরে তাহাদের সফলতার পরিমাণকেও জানা প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে ইহা জানা হয় পরীক্ষা-গ্রহণের মধ্য দিয়া। নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে একসঙ্গে বহুছাত্রের জ্ঞান পরিমাপ করার যে চেষ্টা হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ

পরীক্ষা বলা হইয়া থাকে। মানুষ কিন্তু সমস্ত জীবন ব্যাপীই পরীক্ষা দিয়া চলিতে থাকে। যখনই আমরা পরস্পর মিলিত হই, তখনই জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক, আমরা পরস্পরের সম্বন্ধে জানিতে চেষ্টা করি এবং ঐ জ্ঞানই আমাদের পারস্পরিক পরিচয়ের ভিত্তি। এইরূপে দেখিতে গেলে আমরা জীবনক্ষেত্রে প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া থাকি। জীবনের প্রতি ঘটনা, প্রতি ব্যবহার অন্যকে আমাদের সম্বন্ধে জানিতে সাহায্য করিতেছে। জীবনে পরীক্ষা এড়াইবার উপায় নাই। বিদ্যালয়ের পরীক্ষা অবশ্য আরও ধারাবাহিক। তথাপি শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ কার্যেও পরীক্ষার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই।

সাধারণভাবে পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন অতি প্রাচীন; সম্ভবতঃ চীন-দেশেই ইহা প্রথম আরম্ভ হয়। সমস্ত ঐতিহাসিক যুগেই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যেমন শক্তির পরীক্ষা, তর্কবিদ্যার পরীক্ষা, ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে গুরুশিষ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরীক্ষা হইত। তবে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে পরীক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়।

'পরীক্ষা' শব্দটির প্রতি আমাদের এক স্বাভাবিক ভীতি আছে। পরীক্ষার অপকারিতা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই, তবুও পরীক্ষা করা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। শিক্ষক যেদিন প্রথম শ্রেণীতে আসেন, তখনই তিনি মনে মনে ছাত্রদের পরীক্ষা স্বরু করেন,—'এ ছাত্র পড়ায় ভাল, অন্যটি তেমন ভাল নয়, এ ভীষণ কুঁড়ে,—প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষক নিজের মতামত গঠন করিয়া লইয়া থাকেন। বস্তুতঃ পরীক্ষা করা দোষের নয়—ইহা বরঞ্চ আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপোষক। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষাকে আতঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থায় ইহা যেন শিক্ষার্থীর পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা শিক্ষার্থীর মনে অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার উদ্রেক করে, তাহার যুক্তি, বিচার ও সৃজনী-শক্তিকে আবৃত্ত করিয়া তোতাবৃত্তির উৎসাহ বর্দ্ধন করে; ইহা তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা যথার্থভাবে পরীক্ষিত হয় না।

পরীক্ষার কুফল দূরীকরণে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করা

কিন্তু দোষ-ত্রুটি পরীক্ষার নয়, কুপরীক্ষা-পদ্ধতির। ইহার বিভিন্ন কুফলগুলি দূর করিতে হইলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষকের পরিষ্কাররূপ ধারণা থাকা

প্রয়োজনীয়। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে:

(ক) নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাপ: সাধারণতঃ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ব্যক্তিগতভাবে না দিয়া শ্রেণীগতভাবে পাঠ দেওয়া হয়। কিন্তু নানাকারণে একশ্রেণীর সকল ছাত্র একই ভাবে পাঠ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না এবং একই পাঠ হইতে তাহাদের শিক্ষার পরিমাণও সমান হয় না। ফলে সাধারণভাবে শ্রেণী পাঠগ্রহণ করিয়াছে কিনা এবং শ্রেণীর মধ্যে কে কিভাবে পাঠগ্রহণ করিয়াছে, ইহা প্রতি পাঠদানের পরেই শিক্ষকের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। যদি সমগ্র শ্রেণীর কাছে পাঠ ব্যর্থ হইয়া থাকে তবে ছাত্রদিগকে আবার নূতন করিয়া ঐ পাঠ দিতে হইবে। যদি সাধারণভাবে শ্রেণী পাঠগ্রহণ করিয়া থাকে তবে 'পেছনে-পড়া' ছেলেদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। প্রতি পাঠের পরেই মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক এই পরীক্ষা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। এই ভাবে বিভিন্ন উপায়ে পাঠলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা করা হইলেও কিছুদিন অন্তর অন্তর অধিকতর বিধিবদ্ধভাবে ছাত্রদের লব্ধজ্ঞানের পরিমাপ করা প্রয়োজনীয়। এইরূপ পরীক্ষা ব্যতীত শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের শিক্ষাব্যাপারে সাহায্য ও নির্দেশ-দান সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষা-বিষয়ে নির্দেশ-দানে সাহায্য করাই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) পরীক্ষার দ্বারা কে কৃতী, কে মাঝারী এবং কে পেছনে-পড়া ইহা নির্ণয় করাই শিক্ষকদের নির্দেশ-দানের পক্ষে যথেষ্ট নয়, কোন ছাত্র কেন পিছাইয়া পড়িয়াছে, মাঝারি ছাত্র কেন আরও উন্নতি করিতে পারিতেছে না, উপযুক্ত নির্দেশ ও সাহায্যদানের জন্য ইহাও নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাইতে পারে যে, অংকের পরীক্ষায় কোন ছাত্র খারাপ নম্বর পাইলে তাহার অংকের জ্ঞান কম ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার কারণ বিভিন্ন হইতে পারে। (১) ভাল নামতা না জানার ফলে সে অংক কষিতে ভুল করিতে পারে। (২) যোগ-বিয়োগের পদ্ধতিগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে না পারার জন্য অংক ভুল হইতে পারে। (৩) তাহার মানসিক জগতের কোন আনুভূতিক বিপর্যয়ের জন্যও সে অংকে মন না দিতে পারে। সুতরাং তাহার অংকের জ্ঞান উন্নত করিতে হইলে ঠিক কোথায় এবং কি কারণে তাহার অসুবিধা হইতেছে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। সুতরাং 'কারণ-নির্ণয়ন' (diagnosis) পরীক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

(গ) বৃহৎ সমাজে আমরা সকলে পরিচিত নই। আমাদের সমাজের পরিধি যত বিস্তৃত হইবে, এই অপরিচয়ের গণ্ডিও ততই বৃহৎ হইয়া উঠিবে। অথচ অপরিচিত লোকের সংগেও আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-নিয়োগের কালে পূর্ব হইতেই শিক্ষকপদপ্রার্থী ব্যক্তি পরিচিত না হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই নূতন লোক সম্বন্ধে অপরের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই কাজ সহজ করিবার নিমিত্ত সমাজ অভিজ্ঞান-দানের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান সম্বন্ধে সামাজিক অভিজ্ঞান দিয়া থাকে। কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছে—এই কথার অর্থ, তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান আছে, নূতন পরীক্ষা ব্যতীত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞানের মূল্য সাধারণতঃ অভিজ্ঞানদানকারী প্রতিষ্ঠানের সামাজিক প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান সম্বন্ধে সামাজিক অভিজ্ঞান-দান পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরীক্ষার প্রকারভেদ

বিদ্যালয়ের পরীক্ষা সাধারণতঃ দুইরকম—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরীক্ষা। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রের দোষ-ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে এবং উহা শিক্ষার্থীকে নির্দেশদানে ও সাহায্যদানে সাহায্য করে। বিদ্যালয় ও শিক্ষক তাহাদের নিজেদের প্রয়োজনে এই পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই পরীক্ষা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদিও হইতে পারে। দৈনন্দিন পাঠের পরে শিক্ষক যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাও ইহার অন্তর্গত। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা আবার দুই প্রকারে গ্রহণ করা যায়—(১) বিশেষ বিশিষ্টাকৃতি ও বিধিমতে লিখিত (২) আকৃতিহীন ও মৌখিক। লিখিত পরীক্ষাকে আবার নিম্নলিখিতভাবে গ্রহণ করা যায়—

(ক) প্রচলিত রচনামূলক (Essay type)

(খ) প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত (Standardised)

(গ) নূতন বৈজ্ঞানিক (Adhoc new type)

বাহ্যিক পরীক্ষা সামাজিক অভিজ্ঞানদানের (certificate) উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। এই পরীক্ষা একটিমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না—বিভিন্ন বিদ্যালয় লইয়া এই পরীক্ষা চলে। বাহ্যিক পরীক্ষার মূল্য

অভিজ্ঞানদানকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে; যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানপত্রের মর্যাদা কোন বিশেষ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞানপত্রের মর্যাদা অপেক্ষা অধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্তমান যুগে একই অভিজ্ঞানপত্র দানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মান যাহাতে সমান থাকে তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই চেষ্টা চলিতেছে। অভিজ্ঞানপত্রদান ব্যতীত নির্দিষ্ট চাকুরীতে লোকনিয়োগের জন্য বাহ্যিক পরীক্ষাগ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন, I. A. S., B. C. S. ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরীক্ষার মানদণ্ড

পরীক্ষাকে একটি মানযন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাপড় পরিমাপের জন্য গজের প্রচলন হইয়াছে, চাউলের পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য আছে দাঁড়িপাল্লা, ছাত্রদের জ্ঞান মাপিবার জন্য সেইরূপ পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা! কিন্তু এই পরিমাপের মানযন্ত্র এমন হওয়া চাই যাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। কাপড় মাপিবার "গজ" যদি এমন হয় যে, একই কাপড়কে দুইবার মাপিলে দুইমাপ হয় তবে ঐ "গজের" উপর নির্ভর করা চলে না। পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাহাই। পরীক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইল, (১) ইহা নির্ভরযোগ্য হইবে; অর্থাৎ একটি ছাত্রকে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা একই বিষয় বারবার পরীক্ষা করি তাহা হইলে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল মোটামুটি এক হওয়া উচিত।

(২) ইহা অর্জিতবিদ্যার সঠিক মূল্য ও মর্যাদা নিরূপণ করিবে অর্থাৎ যাহা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা, পরীক্ষা দ্বারা তাহাই যেন মাপা সম্ভব হয়। কোন বস্তু-পরিমাপের কালে এই অসুবিধা হয় না; কারণ, বস্তুটি আমাদের চোখের উপর থাকে। কি মাপিতেছি এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু মানসিক বিদ্যার পরিমাপকালে সাধারণতঃ দেখা যায় আমরা অনেক সময়ে এক জিনিসের পরীক্ষা করিতে গিয়া অপর কোন জিনিষের পরীক্ষা করিয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে গিয়া হয়তো আমরা ভাষা এবং রচনা-ক্ষমতার পরীক্ষা করিয়া বসি।

প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষা: রচনামূলক পরীক্ষা প্রধানতঃ ভাষাবহুল। ভিত্তি ইহার রচনা, উপাদান ইহার ভাব; এবং বাহন ইহার ভাষা। রচনার উৎকর্ষের উপর ইহার সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে। রচনামূলক পরীক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য।—(১) ইহা শিক্ষার্থীর অর্জিতবিদ্যা, জ্ঞান, কৌশল

ইত্যাদি যথাসম্ভব পরিমাপ করিতে চেষ্টা করে; (২) শিক্ষাবিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রেরণা জোগায়; (৩) রচনা লেখায় শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত ও শিক্ষিত করিয়া তোলে।

অনেকেই এই পরীক্ষার প্রথম দুইটি উদ্দেশ্যকে স্বীকার করেন না। ইহাতে ভাষার পক্ষ আশ্রয় করিয়া বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া সর্বদা অর্জিতবিদ্যার, জ্ঞান, কৌশল ইত্যাদির সম্যক্ পরিমাপ হয় না। কিন্তু রচনা-লিখনের শক্তি ও দক্ষতা-অর্জনে এই পরীক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। শুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা একটি মস্ত গুণ। রচনামূলক পরীক্ষাতে এইগুলির চর্চা ও বিকাশ হয়।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে এইরূপ পরীক্ষা-ব্যবস্থার উপর অধিকাংশ লোকের আস্থা নাই। নিম্নলিখিত কারণে প্রচলিত পরীক্ষায় অনেক ত্রুটি দেখা যায়ঃ

(১) প্রশ্নপত্র রচনার ত্রুটি

(ক) প্রশ্নপত্র-রচনাকালে পরীক্ষণীয় জ্ঞান-পরিমাপের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হয় না। সমস্ত বৎসরব্যাপী ছাত্র যে জ্ঞান অর্জন করে, দুই বা তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। সুতরাং পরীক্ষক নিজ বিবেচনামত নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা প্রশ্নপত্র রচনা করিয়া থাকেন। প্রশ্নগুলি রচনামূলক হওয়ায় প্রতি প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট সময়ে ব্যয়িত হয়। ফলে প্রশ্নসংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ রাখিতে হয়। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অধীত বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রশ্ন করা হয় না। অনেক সময়ে ছাত্রগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রশ্ন তৈরী করে; পরীক্ষাতে যদি সেগুলি আসিয়া যায়, তবে খুবই ভাল নম্বর পায়; আর না আসিলে ফেইল করিয়া বসে। এ যেন অনেকখানি লটারি খেলা। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্রের ছাপও প্রশ্নপত্রের উপর অনেক সময়ে পড়িয়া থাকে; কোন কোন পরীক্ষকের প্রশ্নপত্ররচনার একটি বিশেষ ভঙ্গি থাকে, কোন কোন বিষয়ের প্রতি তাহার বিশেষ পক্ষপাত থাকে। ছাত্রগণ তাহা জানিতে পারিলে অনুমান করিতে তাহাদের সুবিধা হয়। এই ত্রুটির জন্যই বর্তমানে বিভিন্ন 'প্রশ্নোত্তরিকা', 'বোধিনী', ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে এবং ছাত্রদের না বুঝিয়া মুখস্থ করিবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে।

পরীক্ষার ফলের অনিশ্চয়তা থাকার দরুণই, ছাত্রদের পরীক্ষাকালীন উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছায় এবং তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) পরীক্ষণীয় বিষয়ের সম্বন্ধে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধারণা না থাকার ত্রুটি।

প্রশ্নপত্র-রচনাকালে ঠিক কি পরীক্ষা হইবে সে-বিষয়ে পরীক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। যেমন, ইতিহাসের প্রশ্নই ধরা হইল :—ইতিহাসে জ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজনীয়। ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান, ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধে ধারণা, ঐতিহাসিক যুক্তি অনুধাবন প্রভৃতি ইতিহাসের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রশ্নপত্রের রচনাকালে রচনাকারী কোন্ দিকে কতখানি গুরুত্ব দিবেন তাহা ঠিক না থাকিলে পরীক্ষার নির্ভরশীলতা গুরুতর ব্যাহত হয়। সাধারণতঃ ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে আমরা কেবলমাত্র ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরীক্ষাই দেখিতে পাই।

(গ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র-রচনাকারী বাহিরের লোক থাকেন; অনেক ক্ষেত্রে তাহারা শিক্ষকও নন। ফলে বিদ্যালয়ের মান ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাহাদের স্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। পাঠ্যতালিকা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে তাহাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে না। অন্যান্য নানা বিষয় নিয়া ব্যস্ততার জন্য তিনি হয়ত প্রশ্নপত্র-রচনায় প্রয়োজনানুরূপ সময়ও ব্যয় করিতে পারেন না। ফলে অনেক সময়ে ছাত্রদের পাঠ এবং পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিতে দেখা যায়।

(ঘ) বিদ্যালয়ের এবং শ্রেণীর মান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে জ্ঞান-পরিমাপের ক্ষেত্রে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা অনেকখানি কমিয়া যায়। প্রশ্ন যদি খুব কঠিন হইয়া পড়ে তাহা হইলে খুব ভাল ছেলে ব্যতীত অপর কেহ তাহার উত্তর করিতে পারে না· এবং এইজন্য মাঝারি ও খারাপ ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। আবার প্রশ্ন যদি অতিরিক্ত সহজ হয় তাহা হইলে সাধারণ ছাত্র হইতে ভাল বা মাঝারি ছাত্রদের তফাৎ ধরা যায় না। ইহাতে পরীক্ষাগ্রহণের নির্ভরশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঙ) পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং প্রশ্নপত্রও তদনুযায়ী রচনা করা হয়। কথন কথন প্রশ্নের ধারা এমন হইয়া থাকে, অতি দ্রুত না হইলে সকল প্রশ্নের সমান উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। এখানে সময়ই পরীক্ষার নিয়ামক বলিয়া ইহা জ্ঞানের পরীক্ষা না হইয়া দ্রুততার পরীক্ষা হইয়া পড়ে।

(২) নম্বরদানকালে ত্রুটি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত পরীক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি সাধারণতঃ রচনামূলক। পরীক্ষিত বিষয়ের মিশ্র প্রকৃতি ও পরীক্ষকের ব্যক্তিগত চরিত্র রচনামূলক পরীক্ষার মস্ত বড় ত্রুটি। প্রশ্নের কোন নির্দিষ্ট উত্তর থাকে না বলিয়া কোন্ বিষয়বস্তু কতখানি লিখিলে কিরূপ নম্বর দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে পরীক্ষকে পরীক্ষকে মতের পার্থক্য হয়। Ballard এই সম্পর্কে একটি পরীক্ষা করেন। তিনি নয়জন পরীক্ষকের নিকট একজন পরীক্ষার্থীর খাতা পর পর দেখিতে দেন। ইহাতে দেখা যায় বিভিন্ন পরীক্ষকের নিকট সেই পরীক্ষার্থী বিভিন্নরূপ নম্বর পাইয়াছে এবং নম্বরের মধ্যে গুরুতর রকম পার্থক্য হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, একই পরীক্ষক একজন পরীক্ষার্থীর খাতা দ্বিতীয়বার দেখিলে (পূর্বের নম্বর সম্বন্ধে স্মরণ না থাকিলে) নম্বরে অনেক তারতম্য ঘটে। বিচার্য বিষয়ের মিশ্র প্রকৃতি ও জটিলতার জন্যই এইরূপ হয়; পরীক্ষকের বিচার অনেকটা নিজের ধারণা ও তার মেজাজ, মর্জি ও পরিবেশেরও উপর নির্ভর করে। আবার সকল পরীক্ষকের নম্বর দানের মানও সমান থাকে না—নম্বর দান করিয়া কেহবা উদার, কেহবা কঠোর থাকেন।

(৩) পরীক্ষাগ্রহণকালের ত্রুটি :

(ক) পরীক্ষা সাধারণতঃ এক সময়ে একই পরিবেশের ভিতর লওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু পরীক্ষার্থীগণ বিভিন্ন পরিবেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসহ পরীক্ষাগৃহে আসে। কেহ বা অসুস্থতার জন্য উত্তর করিতে পারে না, কেহ বা উৎকণ্ঠায় নিজের জ্ঞান অনুরূপ উত্তর করিতে পারে না; ফলে অনেক সময়েই ছাত্রদের প্রকৃতজ্ঞান পরীক্ষিত হয় না। সুতরাং ইহাতেও পরীক্ষার নির্ভরশীলতা কমিয়া যায়।

(খ) অনেকদিনব্যাপী যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, অল্প সময়ের মধ্যে তাহা পরীক্ষা করিতে গেলে অনেক ত্রুটি থাকে। তাছাড়া পরীক্ষাগৃহের পারিপার্শ্বিককে কিছুতেই স্বাভাবিক বলা চলে না। এই সমস্ত কারণে অনেক ছাত্রের প্রকৃতজ্ঞানের যথার্থ বিচার হয় না।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা উন্নত করিবার উপায়

রচনামূলক পরীক্ষা-পদ্ধতির সংশোধক ও সম্পূরক হিসাবে নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রণালী (New Type Test) উদ্ভাবিত হইয়াছে। রচনামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়াছে, নূতন পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেইগুলি যাহাতে আর না ঘটে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আধুনিক বিজ্ঞানীদের এক অভিনব আবিষ্কার। এই নূতন পরীক্ষা বস্তুনিরপেক্ষ; ইহাতে রচনা লিখিতে হয় না; অনেকগুলি ছোট ছোট প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নের সঙ্গে কতকগুলি উত্তরও দেওয়া থাকে। পরীক্ষার্থীকে ঠিক্ উত্তরটি বাহির করিতে হয়। ফলে পরীক্ষার নম্বর বস্তু নিরপেক্ষ হয়। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এবং নম্বর নির্দিষ্ট থাকার ফলে নম্বর পরীক্ষক নিরপেক্ষ হইয়া থাকে। পরীক্ষক খেয়ালখুসীমত পরীক্ষার নম্বর কম-বেশী করিতে পারেন না। একই প্রশ্নপত্রের উত্তর যে-কোন পরীক্ষক যে-কোন সময়ে দেখিলেও সংখ্যামানে ব্যতিক্রম হইতে পারে না। প্রশ্নকর্তা বা পরীক্ষক পূর্বেই তাহার প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ দ্বারা পরখ করিয়া নেন। প্রশ্ন সহজ হইল কি কঠিন হইল, উত্তরের জন্য নির্ধারিত সময় কম হইল কি বেশী হইল, ইহা দ্বারা ছাত্রদের জ্ঞানের তারতম্য ধরা পড়িতেছে কিনা প্রভৃতি পূর্বপ্রয়োগ দ্বারা স্থির করা হয়। পরীক্ষায় কত নম্বর পাইলে মাঝারি, কত পাইলে ভাল, কত পাইলে মন্দ প্রভৃতিও একই ভাবে নির্ধারিত হয়। ফলে ঐরূপ প্রশ্নপত্র প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপ প্রশ্নপত্রে পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সকল দিক্ হইতে কিছু না কিছু প্রশ্ন করা সম্ভব হয়। এইরূপ পরীক্ষার কয়েকটি উদাহরণ ও আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

১। সত্য-মিথ্যা বিচার: সত্য-মিথ্যা নমুনার প্রশ্নগঠনে কতকগুলি তথ্যপূর্ণ বাক্য দেওয়া হয়; ইহার মধ্যে যাহা সত্য তাহাই বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। সত্যের বেলায় (√) টিক-চিহ্ন ও মিথ্যার বেলায় (×) কাটা-চিহ্ন প্রশ্নের বামপার্শ্বে বসাইয়া দিলেই চলে। সত্য-মিথ্যার প্রশ্নাবলী ছাপাইয়া, বোর্ডে লিখিয়া, কিংবা ছাত্রদের খাতায় লিখিয়া দেওয়া চলে। অর্জিতজ্ঞান বা বিদ্যার পরীক্ষাতে, যেমন, ব্যাকরণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদির পরীক্ষাগ্রহণে এই উপায় বেশ কার্যকরী হয়।

প্রশ্নের নমুনা : সত্য হইলে বাম পার্শ্বে V ও মিথ্যা হইলে × চিহ্ন দিতে হইবে :

(১) বাদুড় ডিম পাড়ে।

(২) মোটর গাড়ী বাষ্পে চলে।

(৩) নারিকেল দ্বিদল-বীজপত্র।

(৪) গান্ধীজীর জন্মস্থান গুজরাটের কাথিয়াবাড় প্রদেশ।

(৫) শরৎচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নের একটি প্রধান দোষ এই যে, পরীক্ষার্থী কিছু না জানিয়াও যদি আন্দাজের উপর ঠিক চিহ্ন এবং কাটা চিহ্ন দিয়া বসে, তবু হয়ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর তাহার শুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এইজন্য এইরূপ প্রশ্নে অনেক সময় ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা হইয়া থাকে। ধরুন ১০টি প্রশ্নের মধ্যে যদি একটি পরীক্ষার্থী ৬টি শুদ্ধ এবং ৪টি অশুদ্ধ করে, তবে তাহার নম্বর হইবে মাত্র ২।

২। পরিপূরণ : এই জাতীয় প্রশ্নে একটি বাক্যের এক বা অধিক স্থান শূন্য রাখিয়া তাহা পূর্ণ করিতে দেওয়া হয়। শূন্যস্থানগুলি এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে ঐগুলি পূর্ণ করিবার মধ্য দিয়াই ছাত্রদের বিষয়বস্তুর জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য কতকগুলি বিভিন্ন শব্দও প্রশ্নের ডানদিকে রাখা হয় এবং তাহা হইতে প্রয়োজনানুযায়ী শব্দ লইয়া বাক্য পরিপূরণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

উদাহরণ :

(১) এক সূত্রে বাঁধিয়াছি — —
এক কার্যে সঁপিয়াছি — —।

(২) বিদ্যুৎ দুই প্রকারের ; (১) ও(২)——

(৩) ৮ ÷ {৪ – ২} = ?

(৪) শাহ্জাহান তাঁহার বেগম মমতাজের সমাধির উপর——নির্মাণ ক'রে জগতে বিখ্যাত হন। কুতুবমিনার, গোলাপ বাগ, তাজমহল।

৩। সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উত্তরের নির্বাচন :

এইরূপ প্রশ্নে একটি সমস্যার মীমাংসা স্বরূপ একাধিক উত্তর দেওয়া থাকে। তাহা হইতে পরীক্ষার্থীকে শ্রেষ্ঠ উত্তর নির্বাচন করিতে হয়। যথা—

ঘরে আগুন লাগিলে কি করা উচিত ?

(১) প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া উচিত।

(২) দমকলে খবর পাঠান উচিত।

(৩) নিজে নিজেই আগুন নেভাবার চেষ্টা করা উচিত।

শুধু বামদিকে 'টিক' চিহ্ন দ্বারা শ্রেষ্ঠ উত্তর সূচিত হইতে পারে। এই নমুনার প্রশ্ন সাহিত্য, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, স্বাস্থ্যনীতি, প্রভৃতি বিষয়ে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা চলে।

৪। অসংলগ্নতা বা অসামঞ্জস্যের সন্ধান ঃ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় ঃ একজাতীয় অনেকগুলি জিনিসের মধ্যে একটি বিজাতীয় জিনিসের নাম দিয়া সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের জ্ঞান পরীক্ষা হইতে পারে। শব্দটির নীচে দাগ দিয়া ইহা বুঝাইতে বলা হয়।

উদাহরণ ঃ

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যেটি সামঞ্জস্যহীন সেটিকে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করুন ঃ

(১) আম, জাম, কাঁঠাল, মূলা, কলা, কমলা

(২) সোনা, রূপা, লোহ, তামা, কাঁসা, কয়লা

(৩) গঙ্গা, যমুনা, ভাগীরথী, ইছামতী, ভারতমহাসাগর

৫। কি, কেন, কে, কখন, কোথায় ইত্যাদি দ্বারা ছোট ছোট প্রশ্ন করা যাইতে পারে ঃ এই ধরণের প্রশ্নে লেখার অংশ কিছু থাকে। শুদ্ধ উত্তরের জন্যই কেবলমাত্র সংখ্যামান নির্দিষ্ট থাকে। যথা—

(১) বেতার আবিষ্কার করেন কে? (২) 'গীতাঞ্জলি' কাহার রচনা? (৩) ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কে? (৪) 'থর' মরুভূমি কোথায়? (৫) 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা'—এই গানখানি কাহার রচনা? (৬) (৮×২)÷ ৪×২=কত হয়?

৬। ঠিক করিয়া সাজান ঃ এই ধরণের প্রশ্নে একদিকে কতকগুলি শব্দ বা প্রশ্ন থাকে, অপরদিকে তাহার উত্তর অদল-বদল করিয়া রাখা হয়। এই শব্দগুলি দ্বারা যুক্তি বা তথ্যপূর্ণ বাক্যটি বিশুদ্ধভাবে সাজাইতে দেওয়া হয়। সাহিত্যে শব্দের অর্থ-নির্ণয় ও ইতিহাসে তারিখ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশ্ন খুব কার্যকরী।

উদাহরণ :

প্রশ্ন	উত্তর
(১) উদয়শঙ্কর	যাদুকর
(২) পি. সি. সরকার	নৃত্যবিদ্

নূতন পরীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা

(১) আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে এইরূপ নূতন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিশ্বস্ততা অধিকতর। ইহা অনেকাংশে নির্ভুল, সুদৃঢ় ও সুনির্ধারিত, বস্তুনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক পরিমাপ। ইহাতে এক প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষকের প্রদত্ত সংখ্যামান যেমন ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না, তেমন উত্তর জানা থাকিলে সাধারণতঃ ছাত্রদের পক্ষে উত্তর দিতে অসুবিধা হয় না।

(২) এই প্রশ্নপত্রে উত্তর করিতে সময় কম লাগে বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অধীত জ্ঞানের প্রায় সকল অংশের পরীক্ষাগ্রহণ সম্ভব হয়। এইরূপ প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে পূর্ব হইতে কোন অনুমান করা চলে না—সমস্ত পাঠ্য বিষয়েই প্রস্তুত হইতে হয় এবং মুখস্থ করিয়া লিখিবার সুযোগ থাকে না।

(৩) ভাষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করার ফলে এরূপ প্রশ্নের দ্বারা সাধারণতঃ যাহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাই পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। যেমন, ইতিহাসের জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে গিয়া ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা করা হয় না।

কিন্তু এইরূপ প্রশ্নপত্রে রচনা করার কয়েকটি অসুবিধাও আছে।

১। এইরূপ প্রশ্নপত্র দ্বারা পরিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা সমান দক্ষতার সহিত হইয়া উঠে না। কল্পনাশক্তি, রচনাক্ষমতা, সাহিত্যপ্রতিভা ইত্যাদির পরিমাপ এই প্রশ্নপত্রে সম্ভব হয় না।

২। এইরূপ প্রশ্নপত্র অনেক সময়ে সহজ হইয়া পড়ে এবং পরীক্ষার সময় সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান না হইলে ছাত্রদের মানসম্পর্কে বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এই ত্রুটি নূতন পরীক্ষার ত্রুটি না হইয়া প্রশ্নপত্র-রচনার হওয়া সম্ভব। প্রশ্নপত্র যদি প্রয়োগসিদ্ধ ও আদর্শীকৃত হয় তবে এই ত্রুটি আর থাকে না।

৩। কখন কখনও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যায়। ইহাতে ছাত্রদের জ্ঞান বা বুদ্ধির বিচার ঠিক হয় না।

সুতরাং পরীক্ষাকে আরও সার্থক করিতে হইলে প্রশ্নপত্রে বস্তুনিরপেক্ষ এবং রচনামূলক দুইরকম প্রশ্নেরই স্থান রাখিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের পরিমাপের ক্ষেত্রে বস্তুনিরপেক্ষ পরীক্ষা-পদ্ধতিই অধিকতর প্রযোজ্য; আবার বিশ্লেষণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, ভাব ও ভাষার পরিমাপের ক্ষেত্রে রচনামূলক পদ্ধতিরই প্রয়োজন হয়। তবে একটি বিষয় সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রচনামূলক প্রশ্ন হইলেও, প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই সংক্ষিপ্ত হইবে এবং যথাসম্ভব বস্তুনিরপেক্ষ ভিত্তিতে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রশ্নপত্রের পরিবর্তন করিলেও পরীক্ষার সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। একদিন দু'ঘণ্টা বা তিনঘণ্টা পরীক্ষাগ্রহণের দ্বারা ছাত্রের প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না এবং প্রশ্নপত্রের দোষ-ত্রুটিও কোনও অবস্থায়ই সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়।

প্রগতিপত্র বা Cumulative Record Card

এইজন্য ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং বারবার পরীক্ষা করার প্রয়োজন। পরীক্ষাগ্রহণকে শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসাবে মনে করিতে হইবে। এই সমস্যা-সমাধানের জন্য বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে Cumulative Record Card প্রবর্তন করার চেষ্টা হইতেছে। ছাত্রদের উপযুক্তভাবে পরিচালনা করিতে হইলে কিংবা কোন কর্মপ্রার্থী প্রার্থিতকর্মে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে সমগ্রভাবে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু যে-কোন বিষয়ে একবার বা দুইবার পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। একটি ছাত্র এক শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে গিয়া ঠিকভাবে উন্নতি করিতে পারিবে কিনা, তাহা শুধুমাত্র পরীক্ষার ফলের উপরই নির্ভর করে না; শিক্ষার্থীর শারীরিক ক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার চারিত্রিক গুণাবলী ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং Cumulative Record Card দ্বারা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিমাপের ফলাফল সামগ্রিক এবং ধারাবাহিকভাবে রাখিবার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সংগে সংগেই ছাত্রের Record Card রাখা আরম্ভ হয় এবং কোন ছাত্র এক বিদ্যালয় পরিবর্তন করিয়া অন্য বিদ্যালয়ে গেলে তাহার Record Card সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া চলে।

"A Cumulative Record Card is a Condensation of a Case Study."—বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে উহা ত্যাগ করা পর্যন্ত ছাত্রের সর্বাঙ্গীণ ক্রমবিকাশের হিসাব ইহাতে রাখিতে চেষ্টা করা হয়। এই Record Card রক্ষার ব্যাপারে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা ভাল।

মাপপত্র বা Record Card

(ক) ইহা ছাত্রের সামগ্রিক বিকাশের হিসাব। ইহা তাহার শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অপরকে ধারণা দিবে; সে যে জ্ঞান বা কর্মকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে তাহার সম্বন্ধেও ধারণা দিবে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের হিসাবে Record Card এ বিভিন্নতা থাকিলেও প্রায় সকল Card এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকে:

মাপপত্র রক্ষার নীতি

(১) শারীরিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যপত্র

(২) বুদ্ধির বিকাশ (এই বৌদ্ধিক বিকাশের মান নিরূপিত হয় প্রয়োগ-সিদ্ধ ও আদর্শীকৃত বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষা দ্বারা)

(৩) বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান

(৪) সহ-পাঠ্যক্রমের (co-curricular) বিভিন্ন বিষয় ও কর্মে অংশগ্রহণ ও সাফল্য

(৫) আগ্রহ ও অনুরাগের প্রকাশ

(৬) দায়িত্বগ্রহণ—বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মে অংশগ্রহণ ও ইহার জন্য প্রাপ্ত পুরস্কার ইত্যাদি ছাত্রের দায়িত্ববোধের নিরূপণে সহায়ক হয়।

(৭) ব্যক্তিত্ব—বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্য হইতেই ইহার বিকাশ বোঝা যায়।

(৮) ছাত্রের গৃহ-পরিবেশ সম্বন্ধেও কোন কোন তথ্য ইহাতে থাকা প্রয়োজনীয়।

Cumulative Record Card রাখিবার কালে ছাত্রের বিভিন্ন দিকের বিকাশ-সূচীকে সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করিবার জন্য উপরিউক্ত বিষয়গুলির পরিমাপ একাধিকবার গ্রহণ করা এবং তাহা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকালকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া প্রাথমিক বিভাগ, মধ্যবিভাগ (অষ্টম মান পর্যন্ত) ও উচ্চ বিভাগের (নবম হইতে দশম বা একাদশ মান পর্যন্ত) Record card রাখা চলিতে পারে।

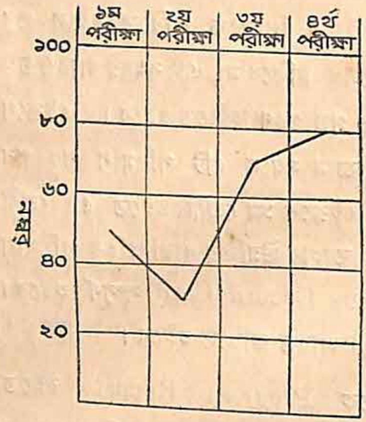
প্রতি বৎসর উপরিউক্ত বিষয়গুলির প্রত্যেকটি সম্বন্ধে ছাত্রের পরিমাপ অন্ততঃ একবার করিয়া Record Card এ লিপিবদ্ধ থাকা উচিত। Record Card এ লিপিবদ্ধ প্রতিটি পরিমাপ একাধিক পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করিয়া রাখিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাথমিক বিভাগের ৫ম শ্রেণীর কোন ছাত্রের অঙ্কের জ্ঞানের পরিমাপ Record Card এ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না, এই বৎসর আরও দুই তিনটি অঙ্ক পরীক্ষার ফল নিয়া তাহার গড় গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে প্রথম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অঙ্কের জ্ঞান সম্বন্ধে ৫টি পরিমাপ পর পর Record Card এ লিপিবদ্ধ থাকিবে। এইরূপে ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন দিকে তাহার উন্নতির ধারাবাহিক পরিমাপ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের Record Card সম্পূর্ণ হইবে। মধ্য বিভাগে আবার নূতন Record card আরম্ভ করিতে হইবে।

Cumulative Record Cardকে Progress Report হইতে তফাৎ করা উচিত। প্রগতিপত্র ছাত্রদের মারফৎ তাহাদের অভিভাবকদের নিকট পাঠানো হইয়া থাকে। অপরপক্ষে, Cumulative Record Card-এর গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়া থাকে। Record Card এ ছাত্রদের সম্বন্ধে যে সব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা সব সময়ে ছাত্রদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়া বাঞ্ছনীয় নহে। প্রগতিপত্রে সাধারণত ছাত্রের পড়া শুনায় উন্নতি বা অবনতির বিবরণ থাকে মাত্র এবং তাহাও বৎসরের পর বৎসর ধারাবাহিক ভাবে থাকে না।

Record Card সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাখ্যামূলক করিবার পদ্ধতি-হিসাবে নম্বরের পরিবর্তে লেখাচিত্রের (graph) সাহায্যে ছাত্রের উন্নতি বা অবনতির হিসাবে রাখা ভাল। ইহার সুবিধা এই যে, একই সঙ্গে অনেকগুলির পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষেপে রাখা চলে, এবং ছাত্রের উন্নতি অনেকটা ছবির মত ধরা পড়ে।

অনেক সময়ে দেখা যায় আধ, এক কিংবা দুই নম্বরের পার্থক্যের জন্য ছাত্রদের মধ্যে তফাৎ করা হয়। কিন্তু এই পরিমাপ ঠিক হয় না তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এইজন্য মানপত্রের মোট নম্বরকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া বিভিন্ন ভাগকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয় এবং সেই ভাগ অনুযায়ী ছাত্রের উন্নতি বা অবনতি ধরা হয়; যেমন, ক বিভাগে যে

ছাত্রের নম্বর থাকে সে ছাত্র অতি উত্তম, খ বিভাগে তাহার পরে ইত্যাদি। ক, খ, গ, ঘ, ঙ—এইভাবে ছক কাটিয়া ছাত্রদের সারা বৎসরের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল রাখা যাইতে পারে। নমুনাস্বরূপ দেওয়া হইল :



পরীক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষের উপর Record Card এর উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে। Record Card-এর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে হইলে বস্তুনিরপেক্ষ পরীক্ষার প্রচলন প্রয়োজনীয়। জ্ঞানের পরীক্ষা তবু সহজ; কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র, সামাজিকতার বোধ ও বিকাশ প্রভৃতির পরীক্ষা আরও অনেক কঠিন। এই সব ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ দেখা যায় যে একই সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষকের মতামত বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তাই এই সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের একত্রিত আলোচনার দ্বারা মতামত ঠিক করা প্রয়োজনীয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত হইবার পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষক যথাসাধ্য বস্তুনিরপেক্ষভাবে, ছাত্র সম্বন্ধে নিজের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া আনিবেন।

সর্বশেষ Record Card-এর ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব।

(১) প্রচলিত বিদ্যালয়ে ছাত্রকে একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উন্নীত করিবার কালে সাধারণতঃ তাহার শেষ-পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা হয়। বাৎসরিক শেষ-পরীক্ষাকেই ছাত্রদের উন্নতির মান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কেবলমাত্র এক পরীক্ষার সংখ্যামান ও সাফল্যের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রকে বিচার করা সম্ভব নয়। যদি কোন ছাত্র কোন্ বিষয়ে অন্যান্য পরীক্ষায় ফেল করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়, তবে এই শেষ-পরীক্ষার ফলাফল দ্বারাই তাহার যোগ্যতার ঠিক বিচার হয় না। ছাত্রের সম্পূর্ণ বছরের বিভিন্ন কাজ ও ইহার ফলাফলকে তাহার উন্নতির অবধারক হিসাবে গণ্য করা কর্তব্য। Record Card এই নির্ধারণে সাহায্য করিতে পারে।

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ছাত্রদের সাহায্যদানের জন্য এই Record Card প্রয়োজনীয়। তাহারা কোন্ বিষয়ে অনগ্রসর তাহা Record Card-এ ধরা পড়ে এবং সেই সেই বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিতে সুবিধা হয়।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কি? বিদ্যালয়ে কি রকম পরীক্ষা প্রবর্তন করা উচিত?

২। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করুন। এই পদ্ধতির ত্রুটি দূর করিতে পারে এরূপ কোন উপায়ের সন্ধান আপনি দিতে পারেন কি?—এই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। নূতন পরীক্ষা-পদ্ধতি কি ত্রুটিযুক্ত? এই পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন ও এই পরীক্ষা-গ্রহণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।

৪। পরীক্ষার মানদণ্ড কি হইবে?

৫। মানপত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৬। মানপত্র রাখিবার উদ্দেশ্য কি? ইহা শিক্ষাক্ষেত্রে কতখানি সাহায্য করে? ইহা রাখিবার নিয়ম কি? একটি মানপত্রের নমুনা দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে শাসন ও শৃঙ্খলা

"শাসন করা তাঁরই সাজে, সোহাগ করে যে।'—ছাত্রদের ভাব তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

—রবীন্দ্রনাথ

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে চাই শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মানুগ নাগরিক। বস্তুতপক্ষে শৃঙ্খলাবোধ মানুষের জীবনের একটি বিশেষ গুণ। শৃঙ্খলা মানুষের জীবনকে ছন্দোময় করিয়া গড়িয়া তোলে। জীবনকে প্রস্তুত করাই শৃঙ্খলার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের জ্ঞানাহরণের প্রতিটি পদক্ষেপেই শৃঙ্খলা জড়িত ও মানুষের চরিত্রগঠনেও ইহা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া এক বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই বলিয়া থাকেন

যে বর্তমানে কি বিদ্যালয়ে, কি পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে, সর্বত্রই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়াছে। এখন শৃঙ্খলা বলিতে কি বোঝায় তাহা স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ শৃঙ্খলাকে আমরা এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারি যে—ইহা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে মানুষের আচার, আচরণ, চিন্তাধারা ও অনুভূতিকে নিয়মানুগ করে; এই বিধি বা নিয়ম আরোপিত কিংবা স্বতঃস্ফূর্ত—দুই-ই হইতে পারে। ("It is a regulation, imposed or spontaneous, of conduct, of thought and of feeling, with the aim of furthering some purpose.") এই শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলা-রক্ষার উপায়কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ বা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল দেশেই বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা-বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা ভাবা যাক। তখন গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীদের জীবনে বিশেষ নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধন ছিল। আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয়দমনের জন্য প্রত্যেক ছাত্রকেই কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শৃঙ্খলা-বিধি শাস্ত্রের বিধানে নির্দিষ্ট ছিল। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ব্যতীত ঐ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিগুলি প্রত্যেক ব্রহ্মচারী পালন করিত। কোন কারণে কখনও নিয়ম-ভঙ্গ হইলে যে অতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তবে ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলাকে শিক্ষার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়মভঙ্গজনিত শাস্তির গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইত না। এইজন্য কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা হইলেও প্রাচীন ভারতের ঋষিকুলের আশ্রম কখনও ছাত্রদের নিকট অপ্রীতিকর বা দুঃসহ হইয়া ওঠে নাই বা গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কখনও তিক্ত হয় নাই।

দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার বিবর্তন

প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টার বিদ্যালয়গুলিতেও নিয়ম-শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। স্পার্টানদের উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত নাগরিক তৈরী; ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখ বা স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য করা হইত না। এইজন্য বিদ্যালয়ে অতি কঠোর-ভাবে নিয়মশৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং সামান্যভাবেও শৃঙ্খলা নষ্ট করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ের এই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি ছাত্রদের

প্রাচীন গ্রীসের কথা

একাত্মবোধ না থাকায় বিদ্যালয় তাহাদের কাছে নীরস ও ভীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইত। সুযোগ পাইলেই তাহারা নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করিত।

প্রাচীন এথেন্সের কথা

প্রাচীন এথেন্সে কিন্তু এত আইনকানুনের কঠোরতা ছিল না। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ই ছাত্রদের মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা-দানের পক্ষপাতী ছিল। ছাত্রদের যুক্তিবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যজ্ঞানের উপর বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে অনেকখানি ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন কুফল দেখা যায় নাই। ইহার কারণ এথেন্সের সমাজজীবন ছাত্রদের সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্যবোধ ও চৈতন্যকে উপযুক্ত-ভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু এথেনিয়ান সমাজ-জীবনে পতন ঘটিবার সংগে সংগে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অনেকখানি ব্যাভিচারে পর্যবসিত হয়।

মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থা

মধ্যযুগে ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে আবার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার বিধান ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের মতই ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও পাপবৃত্তির দমনের জন্য কঠোর শাসনের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের নানারকম কঠিন শারীরিক দণ্ড দেওয়া হইত। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তির প্রচলন মধ্যযুগ হইতে হইয়াছে।

শৃঙ্খলার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাচীন যুগ হইতে এই যে নিয়ম-শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রচেষ্টা, ইহার পেছনে এক দার্শনিক মতবাদ আছে। মানুষের প্রকৃতি ও তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাহার উপরই বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা অনেকখানি নির্ভর করে। প্রাচীন ভারতের বিদ্যালয়গুলির শৃঙ্খলাবিধি অনেকখানি দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে মানুষের দেহ ও তাহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি আত্মিক উন্নতির পরিপন্থী। তাই ইন্দ্রিয়দমনের উপরেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাবিধি গুরুত্ব প্রদান করিত।

প্রাচীন স্পার্টান বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাকে সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে সমাজ-জীবনকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তি-জীবনকে দমন করিবার জন্য শৃঙ্খলাকে ব্যবহার করা হইত।

প্রাচীন এথেন্সে ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। এখানে ব্যক্তিজীবনকেই প্রাধান্য দেওয়া হইত। তাহারা মনে করিত দেহ এবং আত্মা কিংবা ব্যক্তি

এবং সমাজ—ইহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। তাই বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন কঠোর রূপ দেওয়া হয় নাই। ছাত্রগণ আন্তরিক প্রেরণায় জ্ঞান চর্চা করিবে ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে—ইহাই আচার্যদের ধারণা ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপে মানুষকে সাধারণতঃ পাপী বলিয়া কল্পনা করা হইত। তাহারা মনে করিত পাপের দিকেই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। বাইবেলের গল্পে দেখা যায়, মানুষের পূর্বপুরুষকে পাপের ফলেই স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে। সুতরাং শিশুকালেই বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে দমন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের আইনকানুন যেমন কঠোর ছিল, তাহা রক্ষা করার জন্য শাস্তিও তেমনই প্রচুর ছিল।

কিন্তু বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সকল ধর্মই মানুষকে ঈশ্বরের প্রতীক বা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া থাকে। মধ্যযুগের চিন্তাধারার প্রতিবাদ হিসাবেই প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুর অন্তর্নিহিত সৎ প্রবৃত্তিগুলির উপর গুরুত্ব দেন। তাহারা বলেন, শিশু কখনও পাপবোধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহারা স্বভাবতঃই সৎ এবং পবিত্র থাকে। তাহাকে উপযুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলে, তাহার জন্মগত গুণাবলীর বিকাশ ঘটিবে। সমাজ এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ফলে শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। অন্যদিকে, বর্তমান শতাব্দিতে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বকে স্বীকার করা হয় না। মানুষের মতই মানুষের সমাজও সুন্দর এবং ভাল। ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক। শৃঙ্খলা-রক্ষার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করিয়া থাকে।

শৃঙ্খলার প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ ঃ

শৃঙ্খলাকে বিদ্যালয়-পরিচালনার উপায়মাত্র মনে করিলে চলিবে না। শৃঙ্খলা ও বিদ্যালয়-বিধির মধ্যে পার্থক্য আছে। আবার শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল-স্বরূপ গ্রহণ করাও চলিবে না। শৃঙ্খলার মধ্য দিয়াই আমাদের শৃঙ্খলাবোধ জাগিবে। "Discipline is both an end and a means, not merely a means."

শৃঙ্খলা দুরকমের। বহিঃশৃঙ্খলা ও অন্তঃশৃঙ্খলা। বহিঃশৃঙ্খলা, বহিঃশৃঙ্খলের ফল। ইহা অপর কর্তৃক চাপান হয় বলিয়া ভারস্বরূপ; সুতরাং এখানে ভয়বৃত্তির স্থান আছে এবং শাস্তি, পুরস্কার, বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ইত্যাদির

মাধ্যমে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আর অন্তঃশৃঙ্খলা চরিত্রশিক্ষা, আত্ম-সংযম এবং নিয়মানুবর্তিতার দান। Tennyson বলেছেন—

"Self reverance, self knowledge, self control
These three alone lead life to sovereign power."

অন্তঃশৃঙ্খলা আত্মপ্রত্যয়বোধে ও আত্মপ্রেরণায় শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। ইহা তাহার উপর বাহির হইতে জোর-জবরদস্তিতে চাপান হয় না। মানুষের জীবনে বহিঃশৃঙ্খলা ও অন্তঃশৃঙ্খলার দ্বৈত প্রভাব যখন বিরাজ করে তখনই প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হয়।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা

আমরা জানি যে বিদ্যালয় বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজ। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত সেখানে শৃঙ্খলা-বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, পাঠ্যক্রম, দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাঠদান-পদ্ধতি—সমস্ত কিছুই শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার জন্য নানারকম বিদ্যালয়-বিধির প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে দেখা যাইতেছে—বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করিবার দিকেই ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রবণতা, ইহাতেই যেন তাহাদের আনন্দ। এই অবস্থায় শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিক্ষকের হাতে দুইটি মাত্র অস্ত্র আছে—(১) শাস্তি ও (২) পুরস্কার। শাস্তির বা পুরস্কারের বিভিন্নরূপ প্রয়োগ দ্বারা ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বিধি মানিতে বাধ্য করা হয়।

শৃঙ্খলা-রক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা ডাক্তারের ছুরির মতই কখন কখনও প্রয়োজনীয় হইতে পারে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ইহার প্রয়োজন নাই—সমাজ ও বিদ্যালয়ের জীবন যদি আদর্শ প্রণালীতে গঠিত হয় তবে শাস্তি-ব্যবহারের একেবারেই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা না হইলে শাস্তিদান হয়তো একেবারে এড়াইয়া চলা সম্ভব নয়। ইহাকে necessary evil-এর মতই গ্রহণ করিতে হয়।

বিদ্যালয়ে শাস্তি ঃ

শাস্তির প্রকারভেদ

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সমস্ত শাস্তি দেওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ—(১) শারীরিক শাস্তি, (২) মানসিক শাস্তি, (৩) শারীরিক ও মানসিক শাস্তির সংমিশ্রণ।

শারীরিক শাস্তির সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা থাকিলেও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য শারীরিক শাস্তিদান অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

শারীরিক শাস্তি

কিছুদিন আগে পর্যন্তও গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে বেত্রদণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও শৃঙ্খলারক্ষার প্রথা চালু ছিল। তখন তাঁহারা মনে করিতেন যে প্রত্যেক ছাত্রের পিঠই তাহার কান; পিঠে দু এক ঘা না পড়িলে ছাত্র কিছুতেই কানে শুনিবে না। ছাত্রগণ যতই বিভিন্ন শারীরিক শাস্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িত, শিক্ষক মহাশয়গণ আরও নূতন নূতন শাস্তির উদ্ভাবন করিতেন।

সাধারণতঃ শারীরিক শাস্তির উপায়গুলি এইরূপ হইত, যেমন দাঁড় করাইয়া রাখা, নাড়ুগোপালের ভঙ্গিতে দাঁড় করান, পা ফাঁক করিয়া সূর্যের দিকে চোখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা; অনেক সময়ে ছাত্র ঘাড় না ফিরাইতে পারে এইজন্য কপালের উপরে পয়সা বা এই জাতীয় কিছু দিয়া রাখা কিংবা পা যতদূর সম্ভব ফাঁক করিয়া দুই হাতে দুই থান ইট দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকা; বেত মারা, হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পেন্সিল ঢুকাইয়া চাপ দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য বর্তমানে বিদ্যালয় হইতে শারীরিক শাস্তি একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মানসিক শাস্তি

মানসিক শাস্তি সাধারণতঃ এইভাবে হইয়া থাকে, যেমন,—

১। পৃথকীকরণ। অপরাধীকে কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য পৃথক্ বা একঘরে করিয়া রাখা।

২। শিক্ষকের অসমর্থন। আভাসে ইঙ্গিতে বা অন্য উপায়ে অপরাধীকে অসমর্থন করা এবং শিক্ষকের স্নেহ ও সুদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখান।

৩। শ্রেণীর সমক্ষে কিংবা বিদ্যালয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অপরাধীর অপরাধ জানাইয়া তাহাকে লজ্জা দেওয়া।

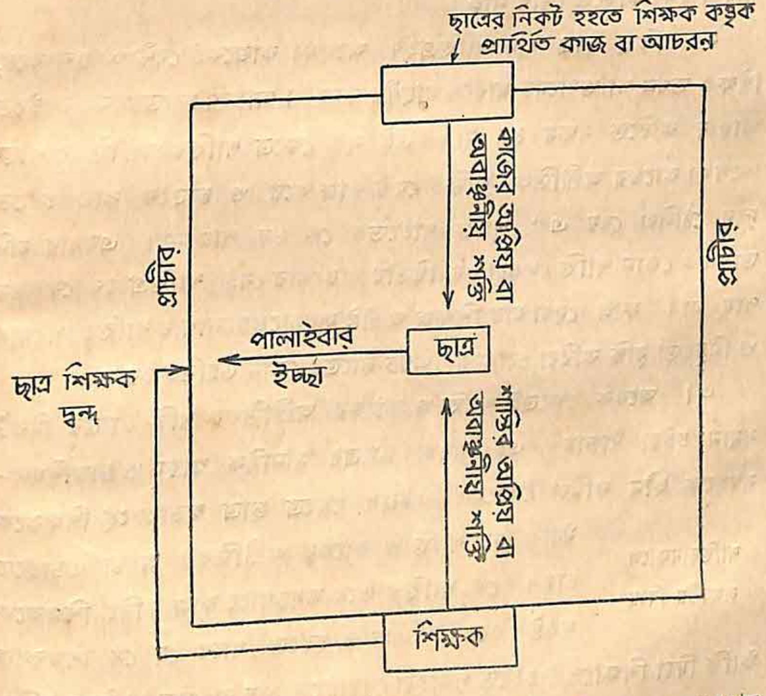
৪। বিদ্যালয়ের কাজের অধিকার বা খেলার অধিকার হইতে কিছু সময়ের জন্য বঞ্চিত করা……ইত্যাদি।

শারীরিক ও মানসিক শাস্তি

এই শাস্তি দৈহিক ও মানসিক শাস্তির সংমিশ্রণ। যেমন—বেঞ্চিতে দাঁড় করিয়া দেওয়া, শ্রেণীর বাইরে নাড়ুগোপাল করিয়া দাঁড় করান, সর্বসমক্ষে বেত মারা, ছোটদের দিয়া কিংবা সহপাঠীদের দ্বারা কান মলান ইত্যাদি।

শাস্তির মনস্তত্ত্ব

যে কাজ ছাত্রের অবশ্য করণীয় অথচ তাহার কাছে অপ্রিয় সেই কাজ আদায় করিবার জন্যই শাস্তির ব্যবহার হইয়া থাকে। যে কাজ ছাত্র স্বেচ্ছায় করিতে চায় বা করিতে ভালবাসে ছাত্রের নিকট হইতে সেই কাজ পাইতে শাস্তির প্রয়োজন হয় না। শাস্তিকে নিম্নলিখিত নক্সার সাহায্যে বোঝান যাইতেছে :—



শিক্ষক ছাত্রকে যে কাজ দিয়াছেন বা ছাত্রের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার আশা করেন, ছাত্রের নিকট তাহা অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং একটি অপ্রীতিকর শক্তি এই কাজ হইতে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। অপর দিকে শিক্ষক শাস্তির অপ্রীতিকর শক্তির সাহায্যে আবার ছাত্রকে সেই কাজের

দিকেই ঠেলিয়া দিতেছেন। সুতরাং এই অবস্থাতে ছাত্র সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই অপ্রীতিকর চাপের মধ্যে পড়িয়া যায়। এইরকম ক্ষেত্রে তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত ব্যবহার আশা করা যাইতে পারে।

১। কাজ হইতে শাস্তি যদি ছাত্রের নিকট অধিক অবাঞ্ছনীয় হয় তবে সে শিক্ষক কর্তৃক প্রার্থিত কাজ করিতে বাধ্য হইবে। এইজন্যই অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক শাস্তির দ্বারা কাজ আদায় করিতে সক্ষম হন। কিন্তু শাস্তির ভয় যখনই থাকে না, সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাজে অগ্রসর হয় না। অধিক পরিমাণ শাস্তিতে যাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, শাস্তির ভয় না থাকিলে জীবনে তাহারা কোন ভাল কাজই করিতে পারে না। ইহাই আমাদের বয়স্ক জীবনে শৃঙ্খলা-রক্ষা না করার অন্যতম প্রধান কারণ—আমরা শাস্তির ভয় ব্যতীত কখনও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখি নাই।

২। কিন্তু ছাত্র যদি শাস্তিগ্রহণ অপেক্ষা কাজকেই বেশী অপছন্দ করে, শিক্ষক তখন শাস্তিদানের দ্বারাও বাঞ্ছনীয় কাজ বা আচরণ ছাত্রের নিকট হইতে আদায় করিতে সক্ষম হন না। এই সব ক্ষেত্রে শাস্তির অপ্রীতিকর শক্তি অপেক্ষা কাজের অপ্রীতিকর শক্তিই বেশী কাজ করে ও ছাত্রকে কাজ হইতে দূরে ঠেলিয়া দেয় এবং শাস্তি পাইতেও সে ভয় পায় না। একবার যদি তাহাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় বার আর সেই শাস্তিগ্রহণে সে ভয় পায় না। ফলে দেখা যায় শিক্ষক অভীষ্ট ফললাভের আশায় শাস্তির পরিমাণ ও নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি করিয়া চলেন। অথচ ছাত্রের কোন উন্নতিই হয় না।

৩। অনেক ক্ষেত্রেই শাস্তি ও কাজের অপ্রীতিকর শক্তি ছাত্রের নিকট সমান হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থা ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য ও ছাত্রশিক্ষক-সম্বন্ধকে হীন করিয়া তোলে। এইরূপ ক্ষেত্রে ছাত্র স্বভাবতঃই শিক্ষককে ফাঁকি দিয়া শাস্তি ও কাজের অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াইতে চায়। সে শাস্তির ভয়ে অসদুপায়ে কাজ করিয়া শিক্ষককে সন্তুষ্ট করে। এমনও হইতে পারে যে সে শিক্ষককে ফাঁকি দিয়া শিক্ষাশ্রেণী হইতে পলাইয়া বেড়াইতে চায় বা শেষ-পংক্তিতে বসিয়া পড়ায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া পড়ে। অন্যদিকে শিক্ষক ছাত্রের ফাঁকি ধরিতে চেষ্টা করেন। ছাত্র যাহাতে কাজ বা শাস্তি উভয়ই এড়াইতে না পারে, তাহার জন্য তাহার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন, আর ছাত্র শুধু ঐ প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। ইহাতে

শাস্তিদানকালে লক্ষ্যণীয় বিষয়

ছাত্র-শিক্ষকে অনেকটা দ্বন্দ্বযুদ্ধের মত আরম্ভ হয় এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ তিক্ত হইয়া পড়ে। ছাত্র মনে করে শিক্ষক তাহাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতেছেন, আর শিক্ষক মনে করেন ছাত্র তাহাকে অমান্য বা অপদস্ত করার চেষ্টা করিতেছে।

শাস্তিকে 'necessary evil' বলা হইয়াছে। যদিও সব সময়েই শাস্তি বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সাহায্য করে না, তবুও বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে কি বিদ্যালয়ে, কি সমাজ-জীবনে শাস্তিদান-প্রথাকে একেবারে এড়ান সম্ভব নয়। তবে শাসনকে সর্বদা সংযম ও গুরুত্ব-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজনীয়।

শাস্তি দিবার কালে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে :—

১। সাময়িকভাবে সমস্যা-সমাধানের জন্যই শাসন। ধীরে ধীরে ছাত্র-শিক্ষকের সম্বন্ধ শাসনের ঊর্ধ্বে তুলিতে হইবে। নিয়মশৃঙ্খলা-রক্ষা ও সুমার্জিত ব্যবহারের প্রতি ছাত্রদের স্বেচ্ছাকৃত আকর্ষণ-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। ঐরূপ ব্যবহারের প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা মন হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।

২। শিক্ষকের ঈপ্সিত কাজ ছাত্রের নিকট কতখানি প্রীতিকর এবং ব্যবস্থিত শাস্তির শক্তিই বা কতখানি, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। যে শাস্তি দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ ঘটে না, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। একবার শাস্তি গ্রহণ করিলে ছাত্রের চারিত্রিক অবনতি ঘটে ও ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধও প্রীতিশূন্য ও তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সব দিক্ ভাল করিয়া বিবেচনা না করিয়া শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

৩। শারীরিক শাস্তি সাধ্যমত পরিহার করিতে হইবে। এই শাস্তি অনেক সময়ে শিশুর শরীরের ক্ষতি করে। এই শাস্তি শিশুকে অনেকখানি পশুর স্তরে নামাইয়া আনে। শিশু শরীরের আঘাত না পাইলে কোন কাজেই প্রবৃত্ত হইবে না—এই চিন্তাধারাই সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। অনেক সময়ে হঠাৎ দেহের কোন অংশে আঘাত লাগার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খুঁত হইয়া যাইতে দেখা যায় এবং জীবনহানিও ঘটে। কানমলা, কিংবা কানের পরে চড় মারা ইত্যাদির ফলে অনেক সময়ে ছাত্রকে চিরজীবনের মতই বধির হইয়া থাকিতে হয়। ইহা ছাড়াও অত্যধিক শারীরিক আঘাত ছাত্রকে একগুঁয়ে ও দুর্বিনীত করিয়া তোলে। শিক্ষকের সংগে হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধার সম্পর্কের পরিবর্তে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহা ছাত্রের মনের কোমল অনুভূতিকে নষ্ট করিয়া দেয় ও সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার পরেই এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে;

অন্যদিকে শৈশবের শারীরিক শাস্তি ছাত্রকে ভীরু ও দুর্বলচরিত্র করিয়া তোলে; দৈহিক পীড়নের হাত এড়াইবার জন্য সে নানারকম মিথ্যাকে আশ্রয় করে, নানারকম ছল ও কৌশলের সুযোগ নেয়। এইভাবে সে তাহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিবার সুযোগ পায় না। সুতরাং নিতান্ত উপযুক্ত কারণ না থাকিলে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে শারীরিক শাস্তিকে বর্জন করাই উচিত।

৪। মানসিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ। সাধারণতঃ শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা মানসিক শাস্তির ভয় আমাদের বেশী। মানসিক শাস্তি নানারূপ হইতে পারে বলিয়া শারীরিক শাস্তির মত ইহা সহজে একঘেয়ে হইয়া পড়ে না। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন ছাত্রের আত্মমর্যাদাকে সচেতন করে, অপর দিকে অনেক সময়ে ইহা আবার শিশুর মানসিক বিকাশকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। মানসিক শাস্তিদানকালে শিশুর বয়স ও চরিত্র এবং জীবনের সমস্যার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধেও অবহিত হইতে হইবে। মানসিক শাস্তি অনেক সময়ে ছাত্রের মনে পরে অসম্ভব প্রতিক্রিয়া করে এবং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে। ইহা দ্বারা এক অপ্রার্থিত ব্যবহার দূর করিতে গিয়া অধিকতর অপ্রার্থিত ব্যবহারের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। শিশু যদি মনে করে যে তাহার সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ও শিক্ষকের নিকট তাহার কোন স্থান নাই, সে চিন্তা তাহার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করে এবং ইহার ফলে শিশুর মনে নানারকম ভাবপ্রবণতা বা কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়। সুতরাং মানসিক শাস্তির প্রদানকালে শিক্ষককে এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫। শাস্তিবিধান কখনই শিক্ষকের খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া হওয়া উচিত নয়। কোন অপরাধের জন্য এক ছাত্র গুরুতর দণ্ড পাইল, সেই একই অপরাধে অন্য অপরাধী দণ্ড পাইল না; কিংবা একই অপরাধের জন্য ছাত্র কখনও দণ্ড পাইল, কখনও পাইল না—এরূপ হওয়া কখনই উচিত নয়। ইহার ফলে শাস্তিকে ছাত্রগণ শিক্ষকের মর্জি বলিয়াই মনে করে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারায়। অপর দিকে কোন্ অন্যায়ের জন্য কখন কোন্ ব্যবস্থা হইবে তাহা ঠিক না থাকার জন্য শাস্তির বাধ্যতামূলক ক্ষমতা কমিয়া যায়। ইহা প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে যে শ্রেণীর ভাই-বোনদের সহিত বিবাদ করার জন্য কখনও কোন ছাত্রকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইল; কিন্তু সেই একই অন্যায় অপরের ক্ষেত্রে শিক্ষক লক্ষ্য

করিলেন না ; আবার সেই ছাত্রই একদিন শ্রেণীর ভাইবোনদের মারধোর করিবার জন্য শাস্তি পাইল, অন্যদিন এই অন্যায় করিয়াও শাস্তি পাইল না। ইহাতে শাস্তির গুরুত্ব তাহার নিকট কমিয়া যায়। ছাত্রদের ইহা বলিতেও শোনা যায়—'আজ মাষ্টারমহাশয় নিশ্চয়ই বাড়িতে রাগারাগি করিয়া আসিয়াছেন। আজ আর আমাদের কাহারও রক্ষা নাই।' ছাত্রদের এই ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা হয় না। সুতরাং তাহারা শিক্ষকের মেজাজ লক্ষ্য করিয়াই অন্যায় করা বা না করা ঠিক করিয়া লয়।

বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে শাস্তিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজনীয়। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে যেমন আপনা হইতেই শাস্তি পাইতে হয়, বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিলেও তেমনই স্বতস্ফূর্ত শাস্তি-গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়।

৬। বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজনীয় এবং ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও মনে এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের হাতেই এই শাস্তির ব্যবস্থার ভার দিয়া বা মোটামুটি তাহাদের সম্মতি লইয়া শাস্তি দেওয়া প্রয়োজনীয়। ছাত্রদের সম্পর্কে শিক্ষককে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হইতে হইবে ; শাস্তি-বিধানের সময়ে তিনি কখনও রাগান্বিত হইবেন না; ছাত্রদের মঙ্গলের জন্যই তিনি তাহাদের শাস্তি দিতেছেন এবং এই শাস্তি দিতে গিয়া তিনি তাহাদের সংগে সমানভাবেই ব্যথিত হইতেছেন, ইহা যদি একবার ছাত্রগণ বুঝিতে পারে তাহা হইলে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

৭। শাস্তি সম্বন্ধে সাধারণ আইন থাকিলেও অনেক সময়ে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে শাস্তি-প্রয়োগে তারতম্য করিতে হয়। এইরকম ক্ষেত্রে এই তার-তম্যের কারণ ছাত্রদের নিকট ব্যক্ত করা প্রয়োজনীয় ও এই সম্পর্কে তাহাদের মনে যেন কোনরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত হইয়া তবেই তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। এইভাবে শাস্তির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যদি ছাত্ররা বুঝিতে পারে তবেই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

বিদ্যালয়ে পুরস্কার

আদর্শ বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-রক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি বা পুরস্কার কাহারও স্থান থাকা উচিত নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের চেষ্টা ও ছাত্রের চেষ্টার মধ্যে কোন

দ্বন্দ্ব থাকিবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। কিন্তু সাধারণতঃ শৃঙ্খলা-রক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি যেমন অপরিহার্য, পুরস্কারকে সেইরূপ একেবারে বাদ দিলে চলিবে না; এবং শাস্তির ন্যায় পুরস্কারও বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়া থাকে।

পুরস্কারের উদ্দেশ্য

প্রার্থিত ব্যবহারে ছাত্রদের আগ্রহস্থষ্টির জন্যই বিদ্যালয়ে পুরস্কারের ব্যবহার হয়। যে সমস্ত ছাত্র লেখাপড়ায় নিয়মানুবর্তিতা, নম্রতা-ভদ্রতা ইত্যাদি বিশেষ চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়, তাহাদের পুরস্কার দিয়া অন্যান্য ছেলেদেরও এই সব গুণের অধিকারী হইতে উৎসাহিত ও প্রলুব্ধ করা হইয়া থাকে এবং ইহা আশা করা হয় যে পুরস্কারের লোভে ছাত্ররা স্বেচ্ছায় তাহাদের অবাঞ্ছনীয় দোষগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে।

শাস্তির ও পুরস্কারের মনস্তত্ত্বে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। এখানেও একটি অপ্রীতিকর শক্তি বাঞ্ছিত ব্যবহার হইতে ছাত্রকে দূরে সরাইয়া দিতেছে; শিক্ষক পশ্চাৎ হইতে অপর একটি শক্তির সাহায্যে তাহাকে বাঞ্ছিত কাজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন। শাস্তির ক্ষেত্রে ছাত্রের করণীয় কাজের শক্তি ও শিক্ষকের কাজ করাইবার জন্য ব্যবস্থিত শাস্তির শক্তি, উভয়ই ছাত্রের পক্ষে অপ্রীতিকর। কিন্তু পুরস্কারের ক্ষেত্রে অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শিক্ষক যে শক্তির সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহা অপ্রীতিকর নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ছাত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব শাস্তি অপেক্ষা কম। আবার অন্য দিকে পুরস্কারের কার্যকরী ক্ষমতা শাস্তির তুলনায় অল্প। ছাত্রের সম্মুখে দুইটি উপায় থাকে—একটি প্রীতিকর, অপরটি অপ্রীতিকর; অর্থাৎ অংক করা অপ্রীতিকর কাজ, কিন্তু অংক করিলে পুরস্কার পাওয়া যাইবে ইহা প্রীতিকর। এখানে সে অংক না করিলে পুরস্কার পাইবে না সত্য, কিন্তু শাস্তিও পাইবে না। অন্যদিকে অংক করারূপ অপ্রীতিকর কাজ হইতে রেহাই পাইবে।

পুরস্কার-বিধান-কালে নিম্নলিখিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয়:

(১) শাস্তির মত পুরস্কারকেও শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে অস্থায়ী উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ক্রমে ক্রমে ছাত্রের ব্যবহারকে পুরস্কারের ঊর্ধ্বে আনিতে হইবে।

(২) উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পুরস্কারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ছাত্রের লোভ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

(৩) একজনকে শাস্তি দিয়া অপরকে পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়। যেমন তুলনামূলকভাবে একজন ছাত্রকে নিন্দা করা ও অপরকে প্রশংসা করা। ইহার ফল খুবই খারাপ হয়। ইহাতে ছাত্রদের মনে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয় ও অনেকে নিজের মূল্য বুঝিতে ভুল করে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যার ভাব সৃষ্ট হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে নিন্দা বা প্রশংসা পাওয়া ছাত্র কেহই বড় হইতে পারে না।

(৪) পুরস্কার-দানকালে সর্বতোভাবে প্রতিযোগিতা এড়াইয়া চলিতে হইবে। পুরস্কারের লোভ অনেক সময়ে ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। এইজন্য যদি এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে কোন নির্দিষ্ট নম্বরের উপর নম্বর পাইলেই সকলকে পুরস্কার দেওয়া হইবে, ইহাতে প্রতিযোগিতা হইবার আর কোন কারণ থাকে না।

(৫) পুরস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষক কখনও পক্ষপাতিত্ব করিবেন না। ইহাতে পুরস্কার-দানের উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ হইবেই, শিক্ষকও ছাত্রের নিকট শ্রদ্ধা হারাইবেন।

(৬) শাস্তির মতই পুরস্কারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়— ইহাও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হওয়া উচিত।

অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শাস্তির মত পুরস্কারকেও অবহেলা করা চলে না। তবে লোভনীয় বা মূল্যবান্ কোন পুরস্কার না দিয়া গুণের স্বীকৃতি-স্বরূপ প্রশংসাপত্র দেওয়া ভাল। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুরস্কার না দিয়া দলগতভাবে বা শ্রেণীহিসাবে পুরস্কার দেওয়া ভাল।

শাস্তি ও পুরস্কার মানুষের অন্তরের পরিবর্তন করিতে ততটা সক্ষম হয় না, তাহা আগে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অন্তরের অনুভূতি ব্যতীত মানুষ শৃঙ্খলাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। যথার্থ শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা ও প্রেরণা কি ভাবে জাগানো যায় তাহাই এখন আমরা আলোচনা করিব।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য নিয়মের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, না শিশুদের নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে চলিতে দেওয়া হইবে, ইহা লইয়া মতান্তর আছে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে মধ্যযুগে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত

প্রবৃত্তিগুলিকে সৎ বলিয়া ধরা হইত না, এবং কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। ইহা স্বাধীনতার উপাসক। প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিই ইহার লক্ষ্য। ফরাসী বিপ্লবের কাল হইতে স্বাধীনতার যে পূজা আরম্ভ হইয়াছে, বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক—জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহা পরিণতি লাভ করিতেছে। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক রুশো শিশুকে নিরংকুশ স্বাধীনতাদানের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিতেন—"শিশুকে ছাড়িয়া দাও, সে যাহা ইচ্ছা করুক। এই স্বাধীনতা ভোগের মধ্য দিয়াই শিশু জীবনে শৃঙ্খলা ও শিক্ষার যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিবে। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্গণ অনেকেই বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা-দানের পক্ষপাতী।

বিদ্যালয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার স্থান

কিন্তু স্বাধীনতা এবং নিয়ম বা শৃঙ্খলা সত্যই কি পরস্পর বিরোধী? সত্যই কি শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব চিরন্তনের? এই প্রশ্ন আলোচনার পূর্বে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজনীয়। স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। ইহা অন্তরে উপলব্ধির ধন। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা-বোধ বিভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যুগ ও সমাজের পরিবর্ত্তনে স্বাধীনতার উপলব্ধিতেও যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা আমাদের পারিপার্শ্বিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারি। স্বাধীনতাকে সাধারণতঃ নেতিবাচক-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যখনই আমাদের ধর্ম, কর্ম, চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি বিভিন্ন বিধিনিষেধের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়, তখনই আমরা স্বাধীনতার স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতে কোন বাঁধা নিষেধ না থাকিলেই আমরা নিজেদের স্বাধীন মনে করি। সুতরাং এই হিসাবে শৃঙ্খলের অনুপস্থিতিকেই স্বাধীনতার সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। এই সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করিলে নিয়মশৃঙ্খলা ও স্বাধীনতাকে পরস্পর বিরোধী বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সত্যই কি মানুষ এমন কোন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে যেখানে সে সম্পূর্ণরূপে নিয়মশৃঙ্খলার বহির্ভূত। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মে বাঁধা। প্রকৃতির সর্বত্রই নিয়ম রাজত্ব করিতেছে এবং জন্ম মাত্রই মানুষকে তাহার অধীন হইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তিগুলিও শৃঙ্খলারই অন্তর্ভুক্ত। অথচ এগুলিকে মানুষ কখনই নিজের

শৃঙ্খল বা স্বাধীনতার পরিপন্থী মনে করে না। বরং ঐগুলির নিবৃত্তির পথে কোন বাঁধা থাকিলে তাহাকে শৃঙ্খল বলিয়া মনে করে।

(২) অন্যদিকে নিয়মশৃঙ্খলা-বহির্ভূত জীবনেও মানুষ আনন্দ বা আত্মোন্নতির সুযোগ পায় না। প্রকৃতপক্ষে সে তাহার প্রয়োজন-নিবৃত্তির ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হয়। তাহার বিবিধ প্রয়োজন-গুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে পরিবর্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হয় এবং নূতন নূতন প্রয়োজন-বোধেরও সৃষ্টি হয়। তাহার জীবনে স্বাধীনতা বা শৃঙ্খল এই প্রয়োজন-নিবৃত্তির পথে বাঁধার অভাব বা বাঁধার মানদণ্ডে স্থির হয়। এইদিক্ হইতে স্বাধীনতাবোধকে আপেক্ষিক বলা যাইতে পারে। এক অবস্থায় একজন নিজেকে যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে, সেখানে সেই অবস্থাই অপরের কাছে পরাধীনতা মনে হইতে পারে। যে ছাত্রের পাঠে স্বাভাবিক অনুরাগ আছে শিক্ষাকালীন বিধিশাসন তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বলিয়া সে মনে করে না। অপরদিকে অনুরাগহীন ছাত্রের নিকট শিক্ষাকালীন বিধিশাসন কঠোর শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আবার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে সামাজিক জীবন-যাপনে বাধ্য করিলে তিনি তাহার স্বাধীনতা হারাইলেন মনে করেন, অন্যদিকে গৃহীকে সামাজিক জীবন হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার বিপরীত অনুভূতি হয়।

(৩) সুতরাং দেখা যায় যে নিয়মশৃঙ্খলার বাহিরে থাকিলেই কেহ স্বাধীনতা পায় না বা সুখ ও সাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে না। নিজ প্রয়োজন-নিবৃত্তির জন্যই আমাদিগকে বিধিনিষেধের অধীন হইতে হয়। মানুষের প্রয়োজন-বোধ একাধিক। কোন একটি প্রয়োজনকে নিবৃত্ত করিতে হইলে অন্য প্রয়োজনগুলি সাময়িকভাবে দমন করিয়া রাখা প্রয়োজন; যেমন সিনেমা দেখিতে গেলে নিজেকে নানাভাবে নিয়মশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। কিন্তু যে সিনেমা দেখিতে ভালবাসে সে কখনই এইরূপ বিধিনিষেধকে শৃঙ্খল মনে করিবে না। মোটকথা মানুষ আপন প্রয়োজননিবৃত্তির জন্য স্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়মশৃঙ্খলার অধীন করে।

(৪) অন্যদিকে মানুষ সামাজিক জীব; সমাজে বাস করিতে হইলে আমাদের পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখানে একের কার্য যদি অপরের স্বাধীনতাকে হরণ করে, তখনই সেই কার্য স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। সুতরাং সমাজে বাস করিতে গিয়া স্বাধীনতা খর্ব্ব হইলেও নিজের প্রয়োজনেই আমাদের কতকগুলি নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করিলে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও প্রয়োজনবোধে মানুষ স্বেচ্ছায় শৃঙ্খল বরণ করিয়া লয়; নিয়মশৃঙ্খলা মানিয়া চলা স্বাধীনতা ভোগ করার অপরিহার্য অঙ্গ।

পার্থক্য করিতে হইলে স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্য করা চলে। যে শৃঙ্খলা নিজ প্রয়োজনে মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তাহা তাহার স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু জোর করিয়া কোন নিয়ম চাপাইয়া তাহার প্রয়োজননিবৃত্তির পথে বাঁধা জন্মাইলে তাহা মানুষের নিকট শৃঙ্খলস্বরূপ হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গুরুগৃহে শিষ্যদিগকে অতি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত। তবু তাহাদের নিকট এই কঠোরতাকে শৃঙ্খলস্বরূপ মনে হইত না। কারণ, ছাত্রগণ জিজ্ঞাসু হইয়াই গুরুর নিকটে আসিত এবং শিক্ষাকালে শৃঙ্খলারক্ষাকে নিজ প্রয়োজননিবৃত্তি ও আত্মোন্নতির অনুকূল বলিয়া বিশ্বাস করিত। এই শৃঙ্খলাপালনে কখনও পরাঙ্মুখ হইলে অনুতপ্ত হইয়া গুরুর সাহায্য কামনা করিত।

সুতরাং দেখা যায় যে বিদ্যালয়ের পরিবেশটি সুন্দর ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে পারিলে সেখানে শৃঙ্খলার অভাব কখনও ঘটিতে পারে না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের যোগ্যতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর আত্মনিয়ন্ত্রণবোধ ও অন্তরে শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত করার মধ্য দিয়াই বিদ্যালয়ে যথার্থ শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এমন করা প্রয়োজনীয় যে পরিবেশে বিদ্যালয়টি একটি ক্ষুদ্র সমাজ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই সেই সমাজের সক্রিয় সভ্য এবং এই বিদ্যালয়-সমাজ শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই প্রয়োজননিবৃত্তির নিয়ামক হইবে। এই বিদ্যালয়রূপ সমাজকে উন্নত করিতে হইলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সহযোগিতাই প্রয়োজনীয়—এই বোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবশ্যই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়পরিচালনে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের অংশগ্রহণের মধ্য হইতেই নিজ দায়িত্বপালনে ও শৃঙ্খলারক্ষায় তৎপর হইবে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থায় শিশুকে যদি উপযুক্ত অংশগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিদ্যালয়ের স্বাধীনতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয়। যে শিশু সারাজীবন কঠোর

নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতরে থাকিয়া আত্মদমন করিয়া আসিয়াছে, সে কখনও নিজ দায়িত্ব-পালনে সচেতন হইতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা-ভোগের সুযোগ তাহার আসিলে সে তাহার অপব্যবহার করে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে হইলে গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের ভিতর দিয়া বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর একাত্মতা জাগ্রৎ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার প্রতি শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন থাকিলেই বিদ্যালয়-সমাজে তাহারা শৃঙ্খলার সহিত সমান ভাবেই স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবে। তাহাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ও অধিকার দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রথার প্রবর্তন করিলে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ দায়িত্বপালনে সচেতন হইবে এবং তাহার ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতা বিকাশের সুযোগ পাইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ হইতে আসে। তাহাদের মধ্যে এক বিদ্যালয়-সমাজের সভ্য—এই একাত্মতা ও সহযোগিতাবোধ জাগান খুবই কঠিন। এখানে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করিতে অনেকখানি সহায়তা করে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়াই এইরূপ বিদ্যালয়-সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে।

কিভাবে বিদ্যালয়ের অন্তঃশৃঙ্খলা জাগান সম্ভব

২। ছাত্রদের প্রয়োজন ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের পরিচালনাকার্য যদি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন-নিবৃত্তির পথে বাঁধা সৃষ্টি করে, তবে তাহারা শৃঙ্খলাশিক্ষায় শ্রদ্ধাবান্ ও যত্নপরায়ণ হইবে না।

৩। শিক্ষার্থীরাই তাহাদের প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠ বিচারক। এজন্য তাহাদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ে বিধি-প্রবর্তনে, পাঠ্যতালিকা নির্বাচনে, কার্যসূচী স্থির করা প্রভৃতি ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর আগ্রহ, ইচ্ছা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কোন ব্যবস্থাই শিক্ষকের ইচ্ছামত জোর করিয়া ছাত্রদের উপরে চাপাইয়া দিলে চলিবে না; সমস্ত কাজেই, তাহাদের সম্মতি ও সহযোগিতা লইয়া অগ্রসর হইলে তাহারা নিজেদের প্রয়োজন-বোধেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিবে। ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইবে না। শৈশব হইতেই প্রকৃত স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার প্রতি এই অনুরাগ ও শৃঙ্খলা-রক্ষার অভ্যাস ভবিষ্যৎ

জীবনে তাহারা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এইভাবেই শৈশবে তাহারা সর্বান্তঃকরণে শৃঙ্খলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবনযাপনের সহিত এক করিয়া ফেলিতে পারিবে।

তবে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেওয়ার সবটুকু দায়িত্ব শুধু বিদ্যালয়ের হাতে ছাড়িয়া দিলেই ইহা সুষ্ঠু ও সার্থক হইতে পারে না। শিক্ষার সমস্ত দিকেই অভিভাবক বা মাতাপিতা যদি বিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা না করেন, বিদ্যালয়ের সংগে সংগে গৃহের পরিবেশও যদি সুন্দর ও বিদ্যালয়ের অনুরূপ না হয়, তবে ভবিষ্যৎ নাগরিক-গঠনের দায়িত্ব বিদ্যালয় কখনও সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা কি? শৃঙ্খলা কি শৃঙ্খলস্বরূপ? প্রকৃত শৃঙ্খলা বলিতে কি বুঝিব? কোন্ উপায়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব?

২। বিদ্যালয়ে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান নির্দেশ করুন।

৩। শাস্তির উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত? শাস্তিদান-কালে কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে?

৪। শাস্তি ও পুরস্কারের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করুন।

৫। 'শাস্তিদান-কালে যিনি অন্যায়কারীর সহিত সমভাবে ব্যথিত হন তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক' —এই উক্তির তাৎপর্য কি?

৬। পুরস্কারের উদ্দেশ্য ও পুরস্কারদান কালীন লক্ষণীয় বিষয়গুলির আলোচনা করুন।

৭। 'শিশুকে ছাড়িয়া দাও, সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক'—এ সম্বন্ধে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৮। 'শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই'—আপনার মতামতসহ ইহার যৌক্তিকতার উল্লেখ করুন।

৯। শিশুর অন্তরে প্রকৃত শৃঙ্খলা-বোধ জাগরিত করিবার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কতখানি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে—তাহা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় গণতন্ত্র

"একা মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক ; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নাই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হ'ল সত্য এক।"

—রবীন্দ্রনাথ

বর্তমান যুগকে গণতন্ত্রের যুগ বলা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হওয়ার পরে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্রের অব্যাহত বিজয়-অভিযান চলিতেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—সমস্ত ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র বিশ্বের দরবারে আদর্শ হইয়াছে। গণতন্ত্র সাধারণ্যে এমন ঠাঁই করিয়া লইয়াছে যে 'অগণতান্ত্রিক' কথাটি প্রায় গালাগালির পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। কোন্ দেশ অপর দেশ অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক ইহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ চলে। গণতন্ত্র ভাল কি মন্দ ইহা প্রশ্ন-বহির্ভূত।

গণতন্ত্রের অব্যাহত অভিযান

যদিও আমরা সকলেই গণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তথাপি ইহার সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নাই। গণতন্ত্র প্রথমতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। স্বৈরাচার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তাহাতে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া এব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন—

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

"Rule of the people, by the people and for the people."

এই উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে সাধন করিবার জন্য গত দুই শত বৎসরে কতকগুলি বিশেষ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (institutions) উদ্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান-গুলির সাহায্যেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ বয়স্ক ভোটাধিকার, প্রতিনিধিমূলক আইনসভা, দায়িত্বসম্পন্ন মন্ত্রিসভা এবং স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা (judiciary) প্রভৃতিকে এই পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি অপরিহার্য। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক লোক মাত্রেরই আইন-সভায় ভোটাধিকার দিতে হইবে। জনসাধারণের ভোটে যে আইন-সভা নির্বাচিত

হইবে, দেশশাসনে তাহার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজনীয়। কাজেই মন্ত্রিবৃন্দের কাজ আইন-সভার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। আবার বড় ছোট সকলকেই আইনের বিচার মানিয়া চলিতে হইবে।

গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অনেকে উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা বলিয়া মনে করেন। তাই, বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র-প্রচলনের অর্থে ছাত্রদের নিজেদের ব্যাপার নিজেরা পরিচালনের অধিকার দান করিতে চেষ্টা করেন। আইন-সভার মত তাহাদের নির্বাচিত কোন সভার উপর বিভিন্ন কার্যের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। আশা করা হয় যে, ইহার ভিতর দিয়া তাহারা গণতান্ত্রিক আদর্শে দীক্ষিত হইবে এবং সমাজ-জীবনের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত হইবে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই গণতন্ত্র নহে

কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত একাত্ম করিয়া এবং শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন সীমাবদ্ধ করিয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ করা হয়। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ জীবনের যন্ত্রমাত্র। ইহাদের কখনও গণতন্ত্রের সহিত একাত্ম ভাবা চলে না। সব কয়টি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও হয়ত কোন দেশকে গণতান্ত্রিক বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে দেশের লোক নিরক্ষর ও দরিদ্র, যাহাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রৎ হয় নাই, সেই দেশে সর্বসাধারণের ভোটাধিকার জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দান করিতে পারে না। গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ। ঐ আদর্শকে কার্যে পরিণত করার জন্যই বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে। গণতান্ত্রিক আদর্শ শুধু রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহার বিস্তার প্রয়োজনীয়। সংক্ষেপে গণতন্ত্র একটি সামাজিক আদর্শ; রাষ্ট্রক্ষেত্রে, অর্থনীতিতে এবং সমাজ-ক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমরা যে বিশেষ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি তাহাকেই গণতন্ত্র বলা চলে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ

গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ সম্বন্ধে আমরা সকলে এখনও সম্পূর্ণ একমত নই। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই নিজেদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু উভয় দেশের আদর্শের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে অনেকখানি। আমরা নীচে গণতন্ত্রের কয়েকটি বিশেষ আদর্শের উল্লেখ করিতেছি। এই আদর্শগুলি

আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতর দিয়া তাহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

(১) আমাদের সামাজিক আদর্শে ব্যক্তির বিশেষ স্থানকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সমাজের প্রতি সভ্যই আপন ক্ষমতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ইচ্ছা অনুসারে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন করিবে—আমাদের সমাজ-জীবনের ইহাই প্রধানতম উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তিকে কখনও অপরের, এমন কি সমাজের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে না।

(২) প্রত্যেক মানুষের যদি স্ব স্ব পথ ও মতে চলিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে পরমতসহিষ্ণুতার ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়িয়া উঠিবে। প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার থাকিবে। মানুষে মানুষে বিভিন্নতা সামাজিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা চলে। সমাজের প্রতিটি মানুষ কখনই এক ছাঁচে ঢালা হইতে পারে না। যত মত তত পথ এবং এক সত্যই বিভিন্ন পথে প্রকাশিত হয় তাহা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত।

(৩) কিন্তু প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র হইলেও তাহারা সমাজের সভ্য। এখানে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। গণ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই সহযোগিতা অন্যতম প্রধান আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

(৪) পারস্পরিক সম্বন্ধ ন্যায় এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। অসত্য বা অন্যায়ের পথে ব্যক্তি উন্নত হইতে পারে না।

(৫) পরস্পরের মধ্যে আলোচনা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতির ভিত্তিতে সামাজিক পরিবর্তন আনিতে হইবে। বিপ্লব বা অস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা গণতন্ত্র চিন্তা করে না।

উপরি-উক্ত আদর্শগুলিকে গ্রহণ করিয়া ঐগুলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করাই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার সহিত সমাজ-ব্যবস্থার অংগাংগী সম্বন্ধ। শিক্ষার দ্বারাই সমাজ সংহতি গড়িয়া ওঠে। সমাজের উন্নতিও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা ভিন্ন ইহার সাফল্য অসম্ভব। অপরদিকে গণতান্ত্রিক আদর্শ এত ব্যপক এবং ইহা এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে যে অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই গণতান্ত্রিক আদর্শকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্থান :

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আমরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়াই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হই। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা মতভেদ বা বাদানুবাদ আছে। দর্শন এবং সমাজ-বিজ্ঞানের বিতর্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষক অনেক সময়ে শিক্ষার আদর্শকে হারাইয়া ফেলেন। বাস্তব এবং সর্বজনগ্রাহ্য করিতে হইলে—গণতান্ত্রিক আদর্শের জন্য শিক্ষা দেওয়াকে শিক্ষার আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষক নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ইঙ্গিত পাইতে পারেন। অপরদিকে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যতীত সমাজে গণতন্ত্রের প্রসার অসম্ভব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, দেশে শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় না—প্রকৃত গণতন্ত্র থাকে মানুষের অন্তরে। প্রত্যেক নাগরিকের মনে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে এবং তাহাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। শিক্ষাই গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন। কাজেই বিদ্যালয় এবং গণতন্ত্রের মধ্যে অংগাংগী সম্বন্ধ। গণতন্ত্র ব্যতীত শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হইতে পারে না; আবার শিক্ষা ব্যতীত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাই বর্তমানে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষাদানের উপায় :

গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে চরিত্রগঠনের শিক্ষা। গণতান্ত্রিক আদর্শ-বাদকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়া এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের আদর্শ, এমন কি প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটির জ্ঞান থাকিলেই কেহ গণতান্ত্রিক চরিত্রগুণের অধিকারী হইতে পারে না। জ্ঞানার্জন এবং ব্যবহারের পরিবর্তন এক কথা নয়। যাহা ভাল বা করণীয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকিলেও সর্বদা আমরা তাহা করিতে পারি না। আচরণ এবং অনুভূতির দ্বারা গ্রহণই চরিত্রশিক্ষার মূলকথা। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিদ্যালয়-সমাজকে গণতান্ত্রিক করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র-শিক্ষা দিতে হইলে সাধারণতঃ আমরা একটি ছাত্রসংসদ গঠন করি। এই সংসদ্ বিদ্যালয়-জীবনের আংশিক পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যালয় জীবনের প্রধান অংশ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শিক্ষাব্যাপারকে এই সংসদের আওতার বাহিরে রাখা হয়। সাধারণতঃ ছাত্রদের পাঠ্যক্রমের সংগে সংযুক্ত এমন কতকগুলি বিষয়-ভার (Co-curricular) ছাত্র সংসদের উপর দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই সংসদ্ নির্বাচিত হয় এবং ইহার আস্থাভাজন সভ্যগণ বিশেষ বিশেষ কার্য-পরিচালনার ভার নেন। কোন কোন বিদ্যালয়ে এই সংসদ্ অনেকখানি স্বাধীনভাবে কাজ করে। আবার কোথাও ইহাতে শিক্ষকের প্রাধান্য অধিক থাকে। এই সংসদের কার্য-পরিচালনার মাধ্যমে গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। গণতান্ত্রিক সমাজ পরিচালনায় বিতর্ক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কোন কোন বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে বিতর্ক-শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকে।

কিন্তু ইহাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা অধিক অগ্রসর হয় বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যালয় জীবনের এক অংশ যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় এবং অপর অংশ একনায়কত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ছাত্রগণ গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করিবে বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু পরস্পর-বিরোধী দুইরূপ আদর্শের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কাই অধিক। গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। ইহার ফলে প্রায়ই ছাত্রসংসদের কাজে নানারূপ গলদ দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিলে ইহাকে সর্বাঙ্গীণভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সকল সভ্যকে (কি শিক্ষক, কি ছাত্র) একই সমাজভুক্ত মনে করিতে হইবে, এবং ভাগাভাগি না করিয়া সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনকে একই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অনেকের মতে ছাত্রগণ যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে গণতান্ত্রিক শিক্ষা-লাভের যোগ্য হয় না। এই ধারণা আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। শৈশবকাল হইতেই আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে আপন দায়িত্ব-গ্রহণের শিক্ষা-লাভ করিতে পারি। আবার প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াও অনেকে ইহা পারেন না। দায়িত্ব-গ্রহণের ক্ষমতা শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তাই গণতন্ত্রে-শিক্ষা যত শিশুকাল হইতে আরম্ভ হয় ততই ভাল। শিশুমনের অনুভূতি যে বয়স্ক জীবনেও বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে তাহা সকল মনস্তাত্ত্বিকই একবাক্যে স্বীকার করেন। সুতরাং নার্সারী বা শিশুবিদ্যালয় হইতেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু শুধুমাত্র বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-অর্জনই এই শিক্ষার

শেষ নয়; এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃত আদর্শানুযায়ী পরিচালিত না হইলে উহারা অ-গণতান্ত্রিক মনোভাবের সৃষ্টির জন্যও দায়ী হইতে পারে।

বিদ্যালয়-সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগ করা চলে:

(১) ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ।
(২) ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ।
(৩) শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ।

যে বিদ্যালয়ে এই তিনরূপ সম্বন্ধই সম্পূর্ণ গণতন্ত্রের নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সহজেই গণতান্ত্রিক মন ও চরিত্র লাভ করে।

১। ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ:—সাধারণতঃ শিক্ষাদানকালে শ্রেণীতে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। এই সম্বন্ধে শিক্ষকই প্রধান অংশ গ্রহণ করেন—ছাত্রদের সংগে সম্বন্ধে তিনি অনেকটা উদার-নৈতিক রাজার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছাত্রদের ভালমন্দ কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার তিনিই করিয়া থাকেন। তাহারা কি পড়িবে, কখন পড়িবে প্রভৃতি বিষয় তিনিই স্থির করিয়া দেন। তিনি বিদ্যালয়-রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! ছাত্রদের ভালমন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনিই বিদ্যালয়ের আইনকানুন প্রবর্তন করেন এবং আইন-ভঙ্গকারীকে দণ্ডদান করেন। ছাত্রশিক্ষক সম্বন্ধে সমস্তক্ষমতাই থাকে শিক্ষকের হাতে, যদিও তিনি তাহা ছাত্রের মংগলের জন্যই ব্যবহার করেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা গণ-তান্ত্রিক সম্বন্ধ নয়—ইহা একনায়কত্ব। এই সম্বন্ধ যত মধুর হউক, ইহা যতই স্নেহরসসিক্ত হউক, ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষক সম্পূর্ণরূপে এক সমাজভুক্ত হইতে পারে না। ছাত্রগণ সর্বদাই শিক্ষকদের সংগে ভয়মিশ্রিত দূরত্ব রাখিয়া চলে। আবার উদারনৈতিক রাজার মত ব্যবহার করিতে হইলে যতখানি চারিত্রিক উন্নতি ও উদারতার প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে শিক্ষক অনায়াসে স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতে পারেন। ইহার ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে; বিদ্যালয়-সমাজ স্বার্থপরতা, নীচতা, কলহবিবাদ, বঞ্চনা প্রভৃতির আকর হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ আবহাওয়ায় থাকিলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই দ্রুত অবনতি ঘটে। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই হয়তো ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে এবং উন্নতির পরিবর্তে উভয়ে উভয়কে নীচে টানিয়া নামাইতেছে।

প্রথমতঃ ছাত্র ও শিক্ষক সম্বন্ধকে আরও ব্যাপক করা প্রয়োজনীয়। শ্রেণীর বাহিরে বিদ্যালয়ের সকল কার্যে তাহা ব্যাপ্ত হইবে। প্রথমতঃ ছাত্রগণ শ্রেণীর বাহিরেই অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ যত ব্যাপক হইবে শিক্ষাকার্য তত সুষ্ঠুভাবে চলিবে; গণতান্ত্রিক সম্বন্ধে প্রথমেই একের নিকট অপরের মূল্য স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজনীয়। শিক্ষকই শুধু ছাত্রদের মংগল এবং উন্নতি বিধান করিয়া যাইবেন, ছাত্রদের নিকট হইতে তাহাদের কিছু গ্রহণ করিবার নাই, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিতে হইবে। ছাত্রের প্রভাবও শিক্ষকের জীবনে—তাহার দৃঢ় ব্যক্তিত্বগঠনে এবং অভিজ্ঞতা-অর্জনে—কম নয়। ছাত্রের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিক্ষকের মনের অনেক প্রয়োজনের নিবৃত্তি করে এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-গঠনে অনেকাংশে সাহায্য করে। ছাত্রদের কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করিতে গিয়া শিক্ষক আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধে শিক্ষকের গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা মনে রাখা উচিত। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং সহযোগিতার নীতি স্মরণ রাখা প্রয়োজনীয়।

যে কোন সমাজে গণতান্ত্রিক নীতি কার্যে পরিণত করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। ছাত্র-শিক্ষকসমাজ ও গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই সমাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি আইন-প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। ঐসব আইনকে বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি বলা হয়। বিদ্যালয়ের কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষকই অন্যান্য শিক্ষকদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মাবলি গঠন করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইলে এই ব্যাপারে ছাত্রদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয়। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক এবং ছাত্রদের প্রতিনিধি লইয়া বিদ্যালয়ের আইন-সভা গঠিত হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের কাজকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। (১) পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত (২) পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত। বর্তমানে শেষোক্ত কাজগুলি সাধারণত ছাত্র-শিক্ষক মিলিত হইয়াই পরিচালিত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমোক্ত কাজগুলি শিক্ষকই সম্পূর্ণরূপে পরিচালন করিয়া

থাকেন এবং এমনভাবে তাহা পরিচালিত করেন যে ছাত্রদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ক্ষমতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন মনে করেন না। ফলে ছাত্রদের অনভিপ্রেত অনেক কাজ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের উপর চাপে। অথচ এই কাজগুলির ভিত্তিতেই ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে পাঠ্যক্রম সাহায্য করে ; পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কাজ ইহার পরিপোষক মাত্র। সুতরাং বিদ্যালয়ের কার্যাবলি নির্ধারণ ও পরিচালনার জন্য একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা প্রয়োজনীয়। পাঠ্যক্রম-প্রণয়ন-ব্যাপারে ছাত্র-প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। ছাত্রদের আগ্রহ ও ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের উপর চাপাইয়া না দিলে তাহাদের মংগল হইবে না, এই ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন না হইলে গণতান্ত্রিক সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং পাঠের বিষয়বস্তু-নির্বাচনে ও শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয়। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ও ছাত্রের উদ্দেশ্য এক না হইলে কিংবা পাঠের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রের অন্তর অনুমোদন না করিলে শিক্ষা কখনও সফল ও সার্থক হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব ছাত্রদের হাতে ন্যস্ত করা প্রয়োজনীয়। ছাত্রগণ এইজন্য নিজেদের মধ্যে সংসদ গঠন করিয়া বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারে, এইজন্য তাহাদের স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক।

গণতান্ত্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপদ্ধতিও গণতন্ত্রসম্মত হওয়া উচিত। ছাত্রগণ নিজ নিজ কার্যের মাধ্যমেই শিক্ষাগ্রহণ করিবে। শিক্ষকের বক্তৃতার নীরব শ্রোতা হইয়া শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিদ্যালয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদিও ছাত্রের অংশগ্রহণ ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজনীয়, কিন্তু ইহা বলা যায় না যে এখানে ছাত্র ও শিক্ষকের স্থানে কোন পার্থক্য নাই। গণতান্ত্রিক সমাজে সকল লোকের স্থানই সমান একথা ঠিক, কিন্তু সমাজে প্রত্যেকেই যে একরকম কাজ করিবে এমন কথা নাই। শিক্ষকের বয়স, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের বলে বিদ্যালয়-সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব করিয়া থাকেন ঠিকই; তবে গণতন্ত্র-সম্মত নেতৃত্ব ও একনায়কত্ব এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ; অনুগামীদের স্বেচ্ছাকৃত স্বীকৃতির উপরই গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব নির্ভর করে। শিক্ষক যদি তাহার নেতৃত্বে ছাত্রের স্বতঃস্ফূর্ত

অনুমোদন লাভ না করেন, তবে তিনি শিক্ষকরূপে অকৃতকার্য হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী-প্রণয়নে, পাঠের বিষয়বস্তু-নির্ণয়ে এবং শিক্ষাদানের কার্যে শিক্ষক নেতৃত্ব করিবেন বটে, তবে এই নেতৃত্বের পেছনে ছাত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অনুমোদন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রয়োজনীয়। এই ছাত্র-শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শুধু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিলেই চলিবে না, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক মনোভাব-সৃষ্টির প্রয়োজন। অবশ্য এই বিষয়ে শিক্ষকের দায়িত্বই অধিক। ছাত্র যত অল্পবয়স্কই হউক কিংবা অনভিজ্ঞ হউক, বিদ্যালয়-সমাজে তাহার স্থান ও সমান অধিকার শিক্ষককে মানিয়া লইতেই হইবে; তাহার ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিতে হইবে। এই সমাজ-জীবনে সেও কিছু না কিছু দান করিয়া থাকে ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে।

(২) ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধঃ বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধও গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ছাত্ররা নিজেদের একসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করে না। ইহার ফলে শ্রেণীর মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলি দলের সৃষ্টি হয় এবং একদল অপর দলের সহিত প্রতিযোগিতা, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। বিদ্যালয়-জীবনে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার অভাব ইহার প্রধান কারণ। অনেক সময়ে বিদ্যালয়ে শ্রেণী-পরিচালনার দায়িত্ব কিংবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব শিক্ষক মহাশয় বিশেষ কোন ছাত্রের উপর ন্যস্ত করেন। তাহাকে হয়তো শ্রেণীর 'মনিটর' বা 'কেপ্‌টেন' বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—এই 'মনিটর' বা কেপ্‌টেন শিক্ষকের অনুকরণ করিয়া স্বৈরাচার হইয়া ওঠে এবং শ্রেণীর অন্যান্য সহপাঠি-ছাত্রের সহিত দুর্ব্যবহার করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রচার করে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধের গণতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।

ছাত্র-ছাত্র সম্বন্ধ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইলে সেখানে প্রত্যেকটি ছাত্রের অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হওয়া দরকার। এই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে শিক্ষকের হস্তক্ষেপ যথাসম্ভব না থাকাই উচিত। গণতান্ত্রিক নিয়মে নির্বাচনের দ্বারা বিভিন্ন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন ছাত্রের উপর অর্পিত হইবে এবং ছাত্রেরা নিজেরাই এই নির্বাচন সম্পাদন করিবে। 'মনিটর' বা কেপ্‌টেনের' পরিবর্তে দায়িত্ব-গ্রহণকারীদের নাম 'নায়ক' বা 'মন্ত্রী' দেওয়া যাইতে পারে। ইহারা তাহাদের কার্যের জন্য শুধু শিক্ষকের নিকট দায়ী না হইয়া ছাত্রদের নিকটও দায়ী হইবে। যাহারা নির্বাচিত নায়ক বা মন্ত্রী হইবে

প্রত্যেকটি ছাত্রের নিকটই তাহারা তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকিবে। সুতরাং নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে কার্য-পরিচালনার দায়িত্ব-গ্রহণের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য মন্ত্রিত্বের সময় নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজনীয়। অন্তত একমাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক শ্রেণীতে নির্বাচন হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের উৎসবাদি প্রতি কার্যেই সকল ছাত্র আপন আপন ক্ষমতা এবং আগ্রহ হিসাবেই যোগ দিতে পারে। বিদ্যালয়ের জীবন এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে।

৩। শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধও একই গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। না হইলে বিদ্যালয়ের অপরাপর সম্বন্ধের উপরও (শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্র-ছাত্র) ইহা প্রভাব বিস্তার করে। যে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্বৈরাচার, সেখানে শিক্ষকগণ অনেক সময়ে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারেও স্বেচ্ছাচার প্রয়োগ করেন; আবার যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান, সেখানে ছাত্ররাও নিজেদের মধ্যে কলহপরায়ণ হইয়া উঠে। সমাজ-জীবন এমনই যে তাহাতে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য ঘটিলে সমগ্র সমাজ-জীবনেই তাহার কুফল দেখা দেয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ ভাল নহে। প্রধান শিক্ষক অপরাপর শিক্ষকদের সাধারণতঃ অসহযোগী মনে করেন এবং শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষককে স্বৈরাচার বলিয়া অভিহিত করেন। শিক্ষকগণের পরস্পরের মধ্যেও সহযোগিতার ভাব নাই। শিক্ষক-শিক্ষক সম্বন্ধ পরিচালনার জন্যও বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা প্রয়োজনীয়।

সংক্ষেপে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে গেলে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা যাইতে পারে।

(১) শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-শিক্ষা করিলেই গণতান্ত্রিক শিক্ষা হয় না।

(২) গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি একাত্মবোধ জাগ্রৎ করার চেষ্টাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার আদর্শ।

(৩) এই চেষ্টায় সফলকাম হইতে হইলে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন তথা তাহার সকল সম্বন্ধ, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-ছাত্র এবং ছাত্র-ছাত্র গণতান্ত্রিক

নীতিতে পরিচালিত হইতে হইবে। ছাত্রগণ ঐরূপ গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করিয়া গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করিবে।

(৪) এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

অনুশীলনী

১। গণতন্ত্র কথাটির অর্থ কি? গণতন্ত্রের নীতিগুলি কি?

২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি?

৩। বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষার স্থান নির্দেশ করুন। কিভাবে এই শিক্ষা বিদ্যালয়ে দেওয়া সম্ভব?

৪। বিদ্যালয় সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি সাধারণতঃ কি হইতে পারে? এই সম্বন্ধগুলিকে কিভাবে গণতান্ত্রিক করা যায়?

নবম পরিচ্ছেদ

চরিত্রগঠন

"We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, we have more education than any man who has got by heart a whole library"

—Swami Vivekananda.

সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাই নয় যাহা চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে না। চারিত্রিক শিক্ষাকে শিক্ষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই শিক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই জীবনে কিংবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কোথাও সফলতা লাভ করিতে পারে না।

চরিত্রের সংজ্ঞা : চরিত্রগঠন বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে চরিত্রের সংজ্ঞা কি ? এক কথায় চরিত্রের কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ আমরা বলিতে পারি ইচ্ছাশক্তির (will) যথাযথ বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করা ও ঠিকপথে পরিচালিত করার ক্ষমতাই চরিত্র। ইচ্ছাশক্তি মানসিক স্তরের (mental plane) উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহার যেমন চলার গতি আছে তেমনই ব্যাপ্তি আছে। মানুষের চরিত্রগঠন তখনই হয়, যখন সে এই মানসিক শক্তিকে বিস্তৃততর করিয়া সুষ্ঠু পথে চালিত করিতে পারে। দৃঢ়চরিত্রের ব্যক্তি সর্বদাই তাঁহার সাধু ও মহৎ ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করিতে পারেন।

চরিত্র মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের অংশবিশেষ। মানুষকে বুঝা অত্যন্ত কঠিন। তাহাকে বুঝিতে হইলে তাহার আচার ও আচরণের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে। কথা, কাজ ও অপরের প্রতি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এইজন্য কে কিরূপ মানুষ এবং তাহার ব্যক্তিত্ব কিরূপ, জানিতে হইলে আমরা তাহার ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়া থাকি। মানুষের কতকগুলি জন্মগত বৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে; এইগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এই বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলি পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে বিশেষ রূপ গ্রহণ করে এবং তাহার ব্যক্তিত্বরূপে প্রকাশ পায়। সেইজন্যই আচার ও আচরণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে। ব্যক্তিত্বের আচরণীয় প্রতিকৃতির (behaviour pattern) যে অংশ সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতি অনুসারে ন্যায়-অন্যায় সদসতের বিচারাধীন তাহাই চরিত্র। চরিত্র নীতিবোধের সহিত জড়িত, নীতি সত্যের সহিত, অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ ও বাধ্যবাধকতার সহিত সংযুক্ত; মানুষ নীতিগত আইনকানুন রক্ষার প্রয়াস পায় চরিত্রের দৃঢ়তা ও পবিত্রতার জন্য।

কিন্তু ইহাই চরিত্রের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নয়। চরিত্রকে আমরা আরও ব্যাপক-ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। চরিত্রকে যদি শুধুমাত্র সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত রীতি-নীতি দ্বারা সদসতের বিচারাধীন করিয়া রাখি তাহা হইলে মানুষের জীবনের উন্নতির সহায়ক এমন অনেক গুণ বাদ পড়িয়া যায়—যেমন অধ্যবসায়, একাগ্রতা, কর্ম-প্রবণতা ইত্যাদি। তাহা ব্যতীত চরিত্রের ভাল ও মন্দ উভয় দিক্‌ই আছে। সুতরাং মানুষের দোষগুণের সমষ্টিকেই তাহার চরিত্ররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অনেকের ধারণা চরিত্র জন্মগত। আমরা সৎ ও অসৎ গুণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করি। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তাহা বিকশিত হয় মাত্র। এমন কি চরিত্র বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া কেহ কেহ মত পোষণ করেন; তাঁহারা বলেন, অপরাধপ্রবণ লোকেদের সন্তান-সন্ততির অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়, আর চরিত্রবান্ লোকের সন্তান উত্তমচরিত্রের হয়। উপরি-উক্ত মতবাদ পোষণকারিগণ জন্মমাত্র মানসিক অসুস্থ (Psychopathic) এবং নৈতিক শিশু-(moral imbecile) চরিত্রে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক গবেষণা দ্বারা চরিত্রের উপর শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের কার্যকরী প্রভাব প্রমাণিত হয়। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, মানুষে মানুষে, চারিত্রিক গুণের পার্থক্য প্রকাশ পায়। ধরুন, আমাদের দাম্পত্য জীবনে এখনও যতখানি যৌন নিষ্ঠা আছে, পাশ্চাত্য অনেক দেশেই হয়তো ততখানি নাই। অপর দিকে সরকারী কাজে (official) পাশ্চাত্য দেশে যতখানি সততা ও নিষ্ঠা আছে, আমাদের দেশে তাহা পাওয়া কঠিন। পরিবেশ এবং শিক্ষার ফলে মানুষের আদর্শবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির যে পরিবর্তন হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অন্যান্য ক্ষমতা—যথা, বুদ্ধি, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা (Aptitude) প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে চরিত্রের পরিবর্তনই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। চরিত্র বিশেষভাবে শিক্ষণীয় বস্তু। আদর্শবাদ, ন্যায়-অন্যায়-বোধ এবং আত্মসংযম চরিত্রের ভিত্তি এবং ইহার ভাবকয়টীই পারিপার্শ্বিক এবং শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

চরিত্রগঠনে শিক্ষার প্রভাব

সুপরিবেশ ও সুপরিচালনা জন্মগত প্রবণতাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিয়া চরিত্রকে উন্নত ও দৃঢ় করে। সুষ্ঠুভাবে চালনা না করিলে চরিত্র অসংলগ্ন ও অগঠিত থাকে। এক হিসেবে আমৃত্যু চরিত্র গঠনের কাজ চলিতে থাকিলেও শৈশব ইহার জন্য প্রকৃষ্ট সময়। মানুষ তাহার পরিবেশের মধ্য হইতে এবং নিজে যাহাকে আদর্শ মনে করে তাহাকে অনুকরণের দ্বারাই চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করে। কি ভাল, কি মন্দ, কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয়, প্রভৃতি ধারণা শিশু এইরূপেই সংগ্রহ করে। নীতি জ্ঞান ছাড়াও বিশেষ বিশেষ চারিত্রিক অভ্যাসও একই ভাবে শৈশবে সৃষ্ট হয়। ভাল, মন্দ, উচিত, অনুচিতের জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ অভ্যাসই চরিত্রের ভিত্তি। একবার ঐগুলি গঠিত হইলে পারিপার্শ্বিকের দ্বারাও ইহাদের ছাপ পড়ে। নিজ নিজ চরিত্র অনুসারেই আমরা আমাদের

নীতিশিক্ষার মধ্য দিয়া চরিত্র গড়িয়া ওঠে

পারিপার্শ্বিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি এবং উহা হইতে ভাল মন্দ গ্রহণ করি। চরিত্রের পার্থক্য হেতু একই পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। শিশুকালে গঠিত চারিত্রিক ভিত্তিই পরবর্তী অভিজ্ঞতার দ্বারা দৃঢ় হয়। শৈশবে গঠিত চারিত্রিক অভ্যাসের পরিবর্তন হয় না,—ইহা বলা যদিও সংগত নয়, কিন্তু এই পরিবর্তন যে সহজসাধ্য নয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং শিশু মনে সংযম, সহিষ্ণুতা, সত্যপরায়ণতা, নির্ভীকতা, অধ্যবসায়, উপচিকীর্ষা, পারস্পরিক সম্প্রীতিভাব প্রভৃতি গুণগুলির বিকাশ করিতে পারিলে এই শিশু পরিণত বয়সে দেশের ও রাষ্ট্রের উন্নতি ও মঙ্গল-বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হইলে তাহার প্রকৃতিগত চরিত্রও দৃঢ় হইবে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের বিচার-শক্তি জন্মাইলে সে কোন হীন বা ক্ষতিকর প্রবৃত্তির বশীভূত হইবে না। লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসংযম, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি নীতির শাসনে সংযত থাকে।

চরিত্র-শিক্ষণে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

এই শিক্ষা কিভাবে দেওয়া সম্ভব ? এক সময় ছিল, যখন পারিবারিক বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিত। ধর্মসম্বন্ধীয় উৎসবানুষ্ঠানে কিংবা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়া তাহারা আত্মত্যাগ, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, ইত্যাদি গুণের অধিকারী হইত। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে সেই আত্মীয়তার বন্ধন আর নাই। যুগের সংগে তাল রাখিয়া না চলিতে পারায় সমাজে অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদি প্রায় অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনও শিক্ষামূলক নাই। বরঞ্চ ইহার গলদই অনেক সময়ে আমাদের অনভিপ্রেত চরিত্রগঠনের জন্য দায়ী। যেমন—আত্মীয়-পোষণ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটিগুলি খুবই দেখা যায়। যুগের পরিবর্তনের জন্য বর্তমান সমাজে সুখী ও সার্থক হইয়া বাঁচিতে হইলে নূতন চারিত্রিক গুণাবলীর প্রয়োজন। সরকারী কাজে নিষ্ঠা ও সত্যতা, আত্মীয়পোষণনীতি ত্যাগ, দেশের স্বার্থকে অন্য যে কোন স্বার্থের উর্ধ্বে স্থাপন —ইত্যাদি গুণগুলির কথা দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক কথায় শিক্ষাদানের একটি প্রাচীন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নতুবা অচল হইয়া গিয়াছে। তাই আমাদের চারিত্রিক অধঃপতন এমন দ্রুত সংঘটিত হইতেছে। ইহা দূর করিতে হইলে আমাদের সমাজ-জীবনের সংস্কার এবং বর্তমা

যুগপোযোগী চরিত্রগঠনের নিমিত্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় বিদ্যালয়কে চরিত্রগঠনের দায়িত্ব বহুলাংশে গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিদ্যালয়ের ভিতরে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ গঠন করিয়া অভিপ্রেত চারিত্রিক গুণের বীজ বপন করা সম্ভব। অবশ্য বিদ্যালয়ের পক্ষে একা এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পরিবারের এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাতেই ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যালয়কেই বিশেষ দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। অনেকের মতে গৃহই শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার স্থান। একথা ঠিক যে সুগৃহ শিশুকে সুশিক্ষা দিতে পারে; কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষাই শেষ নয়, সমাজগত শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন।

কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে নীতি শিক্ষা দেওয়া সম্ভব?

ইহার পরেই আমাদের সম্মুখে সমস্যা দেখা যায়—কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব? পূর্বেই বলা হইয়াছে চরিত্র বংশগত বা স্বভাবগত নয়, প্রধানতঃ চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ইহাকে অর্জন করিতে হয়। চরিত্র-শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের সর্বপ্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে, বক্তৃতা উপদেশ দ্বারা চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় জানিলেই যে আমরা উচিত কাজ করিব এবং অনুচিতকে বর্জন করিব, ইহা সত্য নয়। জানা এবং তাহার অনুরূপ ব্যবহার করা এক নয়। অন্যদিকে উপদেশের দ্বারা চরিত্র-শিক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুফলই দেখা যায়। শিশুকে 'ইহা করিও না, উহা কর'—এইভাবে উপদেশ দিলে তাহার মনে অনেক ক্ষেত্রেই সেই উপদেশ বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি করে। এইজন্য দেখা যায় —যে কাজ করিতে নিষেধ করা যায়, সেই কাজের প্রতিই শিশুর আগ্রহ বেশী থাকে। সুতরাং চরিত্রগঠনের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে 'Character is not taught but caught.' একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ দ্বারাই চরিত্রগঠন সম্ভব এবং ইহার জন্য উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের ভিতরে জীবনযাপন প্রয়োজনীয়। সেই দিক্ দিয়া বিদ্যালয় একটি ছোটখাট সমাজ। এই সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন কর্মের ভিতর দিয়া শিশুরা শিক্ষালাভ করে। সুতরাং যে সমস্ত গুণের প্রকাশ আমরা শিশু চরিত্রে দেখিতে চাই বিদ্যালয় সমাজ ঐ সকল গুণের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া প্রয়োজনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আমরা যদি শিশুর চরিত্রে একাগ্রতা, দায়িত্ববোধ, কর্মপ্রবণতা, স্বার্থত্যাগ, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, সৌন্দর্য

ইত্যাদি গুণের প্রকাশ দেখিতে চাই, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে ও তাহার পারিপার্শ্বিকে ঐ গুণগুলির প্রকাশের সুযোগ থাকা চাই। ছাত্র-ছাত্র, ছাত্র-শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষক ব্যবহারের মধ্য দিয়া ঐ সব গুণের অনুসরণ হওয়া প্রয়োজনীয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মের মধ্যেও ঐ গুণগুলির অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা প্রয়োজনীয়।

শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চরিত্র গঠন হয় না। খেলাধূলা, নানারকম হাতের কাজ, উৎসবানুষ্ঠান করা প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে এই সুযোগ ঘটে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হইলে শিশুদের প্রতিই তাহার সমাধানের ভার দিতে হইবে; ইহাতে তাহাদের বিচার শক্তি, ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিকাশ ঘটে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির যথাযথ পরিচালনাই তাহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই শক্তিকে ক্ষমতাশালী করিতে হইলে হৃদয়ের আবেগ ও প্রবৃত্তিগুলিকে উৎসাহিত করা প্রয়োজনীয়। প্রেম বা ভালবাসা এইরূপ একটি প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিটি সুষ্ঠু পথে পরিচালিত না হইলে মানুষকে ইহা অনেক নীচে নামাইয়া আনে, অন্যদিকে ইহার যথাযথ প্রকাশ মানুষকে অনেক উর্ধ্বে লইয়া যায়। প্রেম, প্রীতি বা ভালবাসা চরিত্রগঠনের একটি প্রধানতম উপাদান। বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়াই শিশুর এই প্রবৃত্তিটিকে সজাগ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের অপরের জন্য অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ভালবাসার এই প্রবৃত্তি তাহাদিগকে নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বৃহত্তর জগতের দিকে লইয়া যাইবে। গৃহে পরিজনও বিদ্যালয়ের বন্ধুদের ভালবাসার মধ্য দিয়াই তাহারা প্রতিবেশী, সমাজ এবং দেশকে ভালবাসিতে শিখিবে এবং এইরূপে তাহাদের মনে বিশ্বমানবতার চেতনা জাগিবে। পারস্পরিক প্রীতি তাহাদের মনের ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বেষ দূর করিয়া মনকে পবিত্র ও মহৎ করিয়া তুলিবে। ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন: "Even an ignorant mother by teaching her boy to love and to act on his love, can be the biggest of educators. It is this that makes so many of our great men of to-day attribute so much to their mothers."

বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে শিশুদের এই বোধ সৃষ্টি করিতে হইবে যে, একা মানুষ কখনও বাস করিতে পারে না। পারস্পরিক সাহচর্য ও সহযোগিতার

দ্বারাই তাহারা জনসেবা-ধর্মে উদ্বুদ্ধ হইবে, দেশের দুর্দিনের সময়ে—যেমন বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দেখা দিলে—ছাত্রসংঘ গঠন করিয়া তাহাদের সেবাকার্যে পাঠান উচিত। ইহার মধ্য দিয়াই তাহাদের চরিত্রগঠন হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষকের উৎসাহ ও পরিচালনা এই কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইবে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তুও উহার পারিপার্শ্বিকের অন্তর্গত এবং উহাদের ভিতর দিয়াও চরিত্রগঠনের সাহায্য হয়। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ্যবিষয়গুলিও শিশুর চরিত্রে ছাপ ফেলে। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়া শিক্ষক তাহাদের সম্মুখে অতি সহজেই সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের চেতনা তুলিয়া ধরিতে পারেন। প্রতিটি গৃহের সহিত পাড়ার যেমন সম্বন্ধ—পাড়া হইতে দেশ এবং দেশ হইতে মহাদেশেরও সেইরূপ সম্বন্ধ—এই সত্য জানার ফলে তাহারা বহুর মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে বহুকে আবিষ্কার করিয়া নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া ওঠে। শুধু তাহাই নয়, ইতিহাস তাহাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় কীর্তি ও ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করিয়া আনে। ছাত্রদের ইহার সহিত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু বই পড়িয়া বা শিক্ষকের নিকট হইতে শুনিয়া নয়, ছাত্রগণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা, শিল্প-প্রদর্শনী, ছবি, ছায়াচিত্র, স্থপতি, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঐতিহ্যের পরিচয় পায় এবং ইহা তাহাদের প্রেরণা দেয় ও বিচার-বিশ্লেষণ করিতে শিখায়।

সাহিত্যেও ছাত্রদের মনের পরিধি প্রসারিত করে। সুসাহিত্যের মধ্য দিয়াই সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা মনকে দেশ, কাল, পাত্রের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে লইয়া যায়। মানুষে মানুষে চিন্তাধারায়, আচার-আচরণে, রীতি-নীতিতে, ইতিহাস ও বংশগতিতে যতই গরমিল থাকুক না কেন, অন্তঃকরণে সব দেশের সব কালের মানুষই এক; সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্নেহ-প্রীতির অনুভূতি ও প্রকাশে পরস্পরের মধ্যে এক বিরাট মিল আছে—এ সত্য সাহিত্য মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং ধর্মের প্রভাবও তাহাদের ছাত্রদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে এই সুযোগও গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য বিশেষ কোন ধর্মমত বা ধর্মীয় আচরণের দ্বারা নয়, কিন্তু দলনিরপেক্ষ প্রার্থনার ব্যবস্থা দ্বারা ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে

শিক্ষা করিলে চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ হইতে মহাপুরুষদের জীবনী, বাণী ও উপদেশ সম্পর্কে আলোচনা করা, সম্ভবমত ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান করার মধ্য দিয়া ছাত্রদের সম্মুখে আদর্শস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যায়।

ভগবান্ কিংবা কোন মহান্ শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রেরণা যেমন মানুষের সহজাত, প্রকৃতির সংগেও মানুষের সেইরূপ স্বাভাবিক সংযোগ। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার, একাত্ম হইবার সুযোগ ও শিক্ষা ছাত্রদের উদার ও মহান্ করে। প্রকৃতির রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের সৌন্দর্যের উপাসক করিয়া তোলে; তাহারা জীবনের সহিত প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সন্ধান পায়। জীবনের আনন্দ, ছন্দোবোধ, ভাবাবেগের বিকাশ এইভাবেই ঘটে; মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রকৃতির সজীবতায় আরও পুষ্ট ও কোমল হইয়া গড়িয়া ওঠে। অসীম সৃষ্টির রহস্যে তাহারা বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। তাহাদের এই সৌন্দর্যজ্ঞান, ছন্দ, ভাব ও অনুভূতির আরও সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের জন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিল্প-কাজের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয়। শৈশবে একবার যে শিশুর এই সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটে, পরবর্তী জীবনে সে কখনও নিষ্ঠুর বা অসুন্দর কাজ করিতে পারে না।

এ কথা ঠিক—চরিত্রগঠনের শিক্ষা দেওয়া যায় না, পরিবেশের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী নিজেই নিজের চরিত্র গড়িয়া তোলে; তথাপি এই পরিবেশ-সৃষ্টি এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব এবং যোগ্যতাই প্রধান। শিক্ষক যদি কর্মনিপুণ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চরিত্রের না হন, তাহা হইলে শিশুর চরিত্রগঠনে তিনি কখনই সাহায্য করিতে পরেন না। সাধারণতঃ দেখা যায় শিশুরা খুব অনুকরণপ্রিয়। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বয়স্কদের আচার, আচরণকে তাহারা অনুকরণ করে। এজন্য শিক্ষকের আচার, আচরণকে এমন সংযত ও সুশোভন করিতে হইবে যাহা শিশুদের সুখী ও অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষক ছাত্রদের শুধু উপদেশ দিয়াই নিজের কর্তব্য সমাধান করিবেন না, নিজেও সেইভাবে কাজ করিবেন। শিশুমন অত্যন্ত সজাগ। সে যদি একবার বুঝিতে পারে যে, শিক্ষক যাহা উপদেশ দেন নিজে তাহা পালন করেন না, তাহা হইলে তাহার মন অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে এবং সেও শঠতা, মিথ্যাচার শিখিবে। স্বামীজী বলিয়াছেন—'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।' নীতিভ্রষ্ট শিক্ষক কখনই শিশুর চরিত্রগঠনে সাহায্য করিতে পারেন না।

মাতাপিতা কিংবা অভিভাবকগণও শিশুর চরিত্রগঠনে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। শিশুর প্রথম শিক্ষা স্থরু হয় গৃহেই এবং জননীর কাছই তাহাদের প্রথম ও প্রধান আশ্রয়। স্থতরাং তাহাদের চরিত্র গড়িতে মায়ের মত আর কেউ সাহায্য করিতে পারেন না, এ কথা সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌গণই স্বীকার করেন। পষ্টালজি বারংবার 'Mothers' Education'-এর উপর জোর দিয়াছেন। মায়ের পরে গৃহে পিতা বা অন্যান্য পরিজনদের জীবনধারা সন্তানদের স্থপথে চালিত করিতে বহুলাংশে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংগে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের সহযোগিতা করা প্রয়োজনীয়।

চরিত্রগঠনে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান

চরিত্রগঠনে শাস্তি এবং পুরস্কারের স্থান আছে কিনা এবং থাকিলেও কতখানি আছে ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে শিশু অন্যায় করিয়া যদি শাস্তি না পায়, সেই অন্যায় সে পুনঃপুনঃ করিবে। শাস্তির ভয় না থাকিলে পারিপার্শ্বিকের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন। উপযুক্ত চরিত্র গঠন করিতে হইলে শিশুকে কঠোর নিয়মকানুনের ভিতর রাখা প্রয়োজনীয়। শিক্ষক ও অভিভাবকের শাসন ব্যতীত শিশুর চরিত্র আশানুরূপভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনেক অভিভাবক আবার পারিপার্শ্বিকের মন্দ প্রভাব হইতে শিশুকে দূরে রাখাই চরিত্রগঠনের প্রধান উপায় বলিয়া মনে করেন। শিশু যাহাতে সকলের সহিত মিশিয়া সমাজের কু-অভিজ্ঞতা অর্জন না করে, সর্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করেন। সাধ্যমত তাহাকে নিজের সংগে রাখেন, নির্বাচিত কয়েকজন ব্যতীত একবয়সী অপর সঙ্গীর সহিত মিশিতে বা খেলাধূলা করিতে দেন না। এইজন্য অনেকে শিশুকে বিদ্যালয়েও যাইতে দেন না। অপরদিকে অনেকে মনে করেন শিশুকে স্বাধীন ভাবে আপন অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং ন্যায়-অন্যায়, সদ্‌সৎ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের স্থযোগ দেওয়া উচিত। তাহাদের মতে ন্যায়-অন্যায়, সৎ ও অসতের জ্ঞান শুধু নিজের অনুভূতির সাহায্যেই হইতে পারে। সত্য, স্থন্দর এবং মঙ্গলের জ্ঞান শিশুর অন্তরেই নিহিত আছে। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই তাহার চরিত্র সত্য, স্থন্দর এবং মঙ্গলের পথে ধাবিত হইবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে যাহা সত্য, চরিত্র-শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাহা আরও সত্য। শাসনের ভয়ে আমরা যে ব্যবহার করি নিজের মনের দিক্ হইতে তাহাকে কিছুতেই সত্য ব্যবহার বলা যাইতে পারে না। সারা জীবনই শাস্তির ভয় কাহারও পশ্চাৎ ধাবন করে না এবং করা উচিতও নয়। এক্ষেত্রে শাস্তির ভয় অপসারিত হইলেই চারিত্রিক গুণাবলীর অবসান হয়। অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ পাইয়া অবাঞ্ছিত ব্যবহারগুলি দ্বিগুণ শক্তিতে উপস্থিত হইয়া চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং আমাদের অধঃপতনের চরম সীমায় লইয়া যাইতে পারে। অন্যদিকে শৈশবে ও বাল্যে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হইয়া প্রাপ্ত বয়সে স্বাধীনতা লাভের পরে আদর্শচরিত্রের লোকেদের অধঃপতনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অপরদিকে দেখা যায় যে, শাস্তির ভয়, সে যত কঠোরই হউক, (মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত) মানুষকে মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। শাস্তি দ্বারা মন্দ চরিত্রকে ভালও করা চলে না—অনেক সময়ে তাহা আরও মন্দ হইয়া পড়ে। শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে যে চরিত্রগঠন হয়—তাহার ভিত্তি এত দুর্বল যে, যে কোন মুহূর্তে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। শাস্তি ও পুরস্কার, সাময়িকভাবে চরিত্রে দু'একটি সদ্‌গুণের সৃষ্টি করিলেও, উহারা চরিত্রে অনেকগুলি অবাঞ্ছিত জিনিষের নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। নিজের ইচ্ছা এবং শাসনভীতি বা পুরস্কারের লোভের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া, ইহা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং দুর্বলচেতা করিয়া তোলে। যাহারা কঠোর শাসনের মধ্যে মানুষ হয় অনেক সময়ে তাহাদের চরিত্রের দুর্বলতা, ভয়, ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

শিশুকালে কৃত্রিম উপায়ে সমাজ হইতে দূরে রাখার ফলও চরিত্রগঠনের উপর খুব ভাল হয় না। প্রথমতঃ সামাজিক অভিজ্ঞতা শিশুর নিকট হইতে দূরে রাখিলে, তাহার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বয়স্কদের সহিত অধিক মেলামেশা করিলে শিশুমনের সারল্য নষ্ট হইয়া অনেক জটিলতা দেখা দেয়। আবার সমাজের শুধু ভাল দিক্‌টির সহিত পরিচয় ঘটিলে তাহার অভিজ্ঞতা অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং পরে যখন কোন না কোন সময়ে সমাজের মন্দ দিক্‌টিও তাহার নিকট প্রকাশ পায়, তখন তাহার পক্ষে চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাই বলিয়া শিশুকে স্বাধীনভাবে সমাজের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন

করিতে দিলেই যে সে তাহার ভিতর হইতে আশানুরূপ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিবে একথাও সত্য বলিয়া মানা যায় না। সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকিলেও অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের দোষে তাহা মন্দ পথে চালিত হইতে পারে। তখন অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইতে পারে। অন্যদিকে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিয়মশৃঙ্খলা, সদভ্যাস প্রভৃতি গুণগুলি গঠন করাইবার জন্য হয়ত কখন শাসন বা পুরস্কারের প্রয়োজন হইতে পারে। তবে আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—শাসন বা পুরস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া কখনই চরিত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। শাসন বা পুরস্কার সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে (negative) চরিত্রের উপর কাজ করে। ইহা কতগুলি অন্যায় বা অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা হইতে দূরে রাখিতে সাহায্য করে মাত্র। ইহার সংগে সংগে যদি সুপরিবেশে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাহাকে না করিয়া দেওয়া হয়, তবে চরিত্র গঠন করা সম্ভব নয়।

শাসন বা পুরস্কারের কুফল যাহাতে চরিত্রগঠনের উপর না পড়ে তাহার দিকেও সর্বদা দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়। অতিরিক্ত শাসনের ফলে হীনমন্যতা, তাকিকস্বভাব, মিথ্যাচার প্রভৃতি নানারূপ চারিত্রিক দোষের সৃষ্টি হইতে পারে।

সুতরাং আলোচনা করিয়া এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি বা পুরস্কারের আশ্রয় গ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক থাকে। তবুও আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, বাহিক শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্য গ্রহণ না করিলে শিশুর সদভ্যাস-গঠন সর্বদা সম্ভব হয় না। সে যদি কৃত অপরাধের গুরুত্ব না বুঝিতে পারে, সেই অপরাধ সে পুনর্বার করিবে। তবে সেই শাস্তি যেন স্থায়ী না হয় এবং অপরাধের গুরুত্বও শিশুর গ্রহণ-ক্ষমতা অনুসারে অন্যায় সংশোধনের নিমিত্ত হয়। ইহার সংগে সংগে বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশও তাহাকে দিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—অভিভাবক চান না শিশু সিনেমা দেখে। তিনি শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া সাময়িকভাবে সিনেমা দেখা হইতে বিরত করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই সংগে শিশুর উপযোগী আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া না দিলে, সে এই প্রলোভন হইতে বেশী দিন দূরে থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

অনুশীলনী

১। আমরা কিরূপে চরিত্রকে ব্যাখ্যা করিতে পারি ? নীতির সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ কি ?

২। চরিত্র কি জন্মগত ? চরিত্রগঠনে কোন্ কোন্ শক্তি সাহায্য করে ?

৩। "Character is not taught but caught"—এই উদ্ধৃতি সম্বন্ধে আপনার মতামত যুক্তি সহকারে ব্যক্ত করুন।

৪। চরিত্র-গঠন-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যসাধনে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব কতখানি এবং কিরূপে বিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করিবে ?

৫। পাঠ্যবহির্ভূত কার্যকলাপের মাধ্যমে চরিত্রগঠন হয়। কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে দৃষ্টান্ত সহ বিচার করুন।

৬। নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান কি ?

৭। চরিত্র-শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতাপিতা বা অভিভাবকদের দায়িত্ব কতখানি ? কিভাবে তাঁহারা এই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন ?

দশম পরিচ্ছেদ

ধর্মশিক্ষা

"ধর্মবোধ জিনিষটাকে যদি আমরা মানুষের সর্বাঙ্গীন চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া, আলো, আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণ সঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড় হইয়া উঠিতে থাকে।"

—রবীন্দ্রনাথঠাকুর

ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রস্তুত হইবার পূর্বে আমরা ধর্ম কাহাকে বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া দেখা দরকার। সাধারণ কথাতে আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত আচরণকেই বুঝি ; যেমন, হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, শিখধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। 'স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত।' মানুষের

প্রকৃতিতে নিহিত আছে অনন্তবোধ, এই অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং ইহার প্রেরণায় সমস্ত কাজ করাই তাহার ধর্ম। মানুষকে যাহা সমস্ত চিন্তায়, সমস্তরূপ-বিকাশে ধারণ করিয়া থাকে তাহাই ধর্ম। ধর্মের এই সংজ্ঞার মধ্য হইতেই আমরা ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি ভগবানে বিশ্বাস ও ভালবাসা, এবং এই বিশ্বাসের দ্বারা চলিত নীতি অনুসরণের দ্বারা জীবন গঠন করাই মানুষের ধর্ম।

ধর্ম মানুষের শিক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—'Religion is the innermost core of education.' প্রাচীন কালে ধর্মশিক্ষাই ছিল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিদ্যায়তন ছিল ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সংগে সুযুক্ত। ব্রাহ্মণ ও ধর্মযাজকগণের হাতে ছিল শিক্ষাদানের ভার। ভারত ও ইউরোপের মধ্যযুগে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

আধুনিক কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য বস্তুতান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল তখন ইহার উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্ত্রে ভারতকে দীক্ষিত করা। শাসকেরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবার ফলে ঐ বিদ্যালয়গুলি রাজনৈতিক কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। ভারতবাসিগণ শুধুমাত্র ইংরেজ সরকারে চাকুরী লাভের আশায় ঐসব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলে বিদ্যালয় শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানলাভের কেন্দ্র হইয়া পড়িল; চরিত্র-শিক্ষা, সামাজিক নীতি-শিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বাহিরে পরিবার কিংবা ধর্মের মাধ্যমে চলিতে লাগিল।

বর্তমান পরিবর্তিত সামাজিক ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা তাহার পুনরালোচনা হওয়ার প্রয়োজন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পরে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনে বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা-দানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবনধারণ-মানের উন্নতি, এবং জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারাও মানুষের সুখ শান্তি যে বৃদ্ধি পায় নাই তাহা সাধারণভাবে বলা চলে। বর্তমানে মনুষ্যসমাজ—যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির আতঙ্ক লইয়াই জীবন কাটায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ এবং অশান্তি লাগিয়াই আছে। অনেকে মনে করেন—ইহার মূল কারণ আমাদের নৈতিক অধঃপতন ও আদর্শের অভাব। আমাদের জীবন-যাত্রা যেন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আগাইয়া চলিয়াছে। গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়া চলাই যেন জীবনের চরম পরিণতি।

ইহার ফলে আমাদের সমাজজীবনে নৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

ধর্মই মানুষের জীবনকে ধারণ করে। জীবনের মূলে আছে অনন্তের সংগে জীবনের সংযোগ! ইহার সংস্পর্শেই মানুষ ব্যাপ্তি ও চৈতন্যকে উপলব্ধি করিতে পারে; ইহার দ্বারাই তাহার পাপপুণ্য, ন্যায় ও নীতিবোধ জন্মে। সুতরাং বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ আকারে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হউক বা না হউক, নীতিশিক্ষা দেওয়া যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। প্রাচীন ভারতবর্ষের মত আমাদের শিক্ষাকে আবার নীতিকেন্দ্রিক করিয়া তোলা প্রয়োজনীয়। ভারতের দর্শনই ইহার বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক জীবনদর্শনই ইহার সভ্যতা ও কৃষ্টির চূড়ান্ত বিকাশ। ইহাকে আজ আমরা হারাইতে বসিয়াছি। শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই ইহাকে ফিরাইয়া আনিয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা সুন্দর ও সুষ্ঠু করিয়া তুলিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই যে ধর্মশিক্ষা দিতে হইবে এমন নয়। ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলে নৈতিক জীবনে বিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষাকে দেশের প্রাচীন ধারা হইতে বিযুক্ত না করাই ভাল। আমাদের জীবনদর্শন ও আদর্শবাদ ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মহীন নীতিশিক্ষা সম্ভব হইলেও ভারতের পক্ষে তাহা শুভকর না হইতে পারে। অনন্ত কোন শক্তিতে বিশ্বাস রাখিলে, তাঁহাকে সকল নীতির উৎস বলিয়া গণ্য করিলে নীতিশিক্ষা অধিকতর সহজ হইয়া পড়ে।

অনেকের মতে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান বাধা। ধর্ম লইয়া অতীতে যাহা সংঘটিত হইয়াছে বর্তমানেও তাহার রেশ থামে নাই। কিন্তু মনে হয় যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহা ধর্মশিক্ষার অভাবের জন্য ঘটিতেছে। নিজের ধর্মে যাহার আস্থা ও শ্রদ্ধা নাই, অপরের ধর্মকে সে কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়াই এই শ্রদ্ধা ফিরাইয়া অনিতে হইবে। যেদিন আমরা সত্যই সত্যধর্মে বিশ্বাস করিতাম, সেদিন ধর্ম নিয়া ভারতবর্ষে কোন দ্বন্দ্ব হয় নাই। ধর্মকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করার ফলেই উহার নামে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিয়াছে।

একথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ধর্ম বলিতে আমরা কোন বিশেষ পথ বা মতকে গ্রহণ করিব না। ধর্ম আলোর মত। ধর্মপুস্তক পাঠ করাইয়া কিংবা নির্দিষ্ট কোন ধর্মগত আচরণের দ্বারা বা উপদেশের দ্বারা মানুষের ধর্মবোধ জাগ্রৎ

করা যায় না ; ইহা বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার জিনিস নয়। 'বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নয়।' সাধকেরা বলেন—ইহা কোনমতেই পঠন-পাঠনের ব্যাপার নয়। ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মকেই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষা ইহার পরিবেশের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বক্ষে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানবজীবনে সংযোগ ঘটে, যেখানে তরুলতা ও পশুপক্ষীর সংগে মানুষের আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণের বাহুল্য মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করে না, কর্তব্যবুদ্ধি যেখানে সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা খণ্ডিত না হইয়া বিশ্বজনীন মঙ্গলের আদর্শকে গ্রহণ করে এবং ত্যাগ ও মঙ্গলকর্মে তাহা প্রকাশ করে ; পরস্পরের ব্যবহারে যেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতি থাকে, সেই পরিবেশেই ধর্মশিক্ষা সার্থক হয়। বিদ্যালয়ে এইরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে। সেখানে শিক্ষার্থিগণ সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত করিবে, আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়া জ্ঞানের আলোচনা করিবে, প্রতিদিনই তাহারা প্রার্থনার মধ্যদিয়া সেই মঙ্গলময় শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে শিখিবে। বিভিন্ন ধর্মের বাণীর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহার মনে নীতিবোধ জাগরিত করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সমাজের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন ধর্মগত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করিয়া পরস্পরের প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করিবে ও পরধর্মসহিষ্ণু হইবে—এইভাবেই তাহারা ধর্মের মূলতত্ত্বকে গ্রহণ করিয়া জীবনকে সুন্দর ও সুখী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

অনুশীলনী

১। মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান কি ?

২। বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এবং কিভাবে তাহা দিতে হইবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করুন।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি

বর্তমানকালে দেশে দেশে, মানুষে মানুষে অনেক ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ফলে স্থানের দূরত্ব আর প্রাকৃতিক বাধা, একদেশের সহিত অপরের সংযোগে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তরের দ্বাররক্ষী হিমালয় পর্বতের বাধা অতি সহজে অতিক্রম করিয়া উড়োজাহাজের সাহায্যে সোভিয়েৎ প্রধান মন্ত্রী ভারতে আসিলেন। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, বিশাল সমুদ্রের অন্তরায়—কোন বাধাকেই আর মানুষ গ্রাহ্য করে না; পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া আজ আর কোন সমস্যার মধ্যেই গণ্য হয় না। অন্যদিকে মুদ্রাযন্ত্র, বেতারবার্তা, টেলিভিসন প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানও সহজসাধ্য হইয়াছে। দেশে দেশে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন ও বিস্তৃত উৎপাদনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও সহজ হইয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া সর্বদেশের মধ্যে মধুর ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির গুরুত্ব

আবার একদিকে সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ হইতেছে, অপরদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা এবং হিংসার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই দেশে দেশে স্বার্থের সংঘাত, আদর্শের সংঘাত এবং পরস্পরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগের সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন—বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা পৃথিবীর মনুষ্যজাতি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা দ্রুত মানব সভ্যতাকে উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া কি কলহ-বিবাদের দ্বারা বিশ্বে অশান্তির অনল জ্বালাইয়া মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে?

বিভিন্ন দেশগুলি বাহ্যিক সম্প্রীতির ভান করিলেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ ও প্রতিযোগিতার ফলে মানব-সভ্যতা-ধ্বংসের আশঙ্কা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা দুইটি

বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি এবং সর্বদাই তৃতীয়টির জন্য আতঙ্কিত হইয়া আছি। বিশেষ করিয়া আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি আবিষ্কার হওয়ার পরে যুদ্ধের আতঙ্ক আমাদের আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানব-সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করিবে বলিয়া সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে বর্তমান মানবসভ্যতার সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইল আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-স্থাপন ও যুদ্ধভয়-নিবারণ।

বিভিন্ন উপায়ে যুদ্ধনিবারণের চেষ্টা

মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই যেমন যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছে তেমন ইহা নিবারণেরও বহু প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতা হইতে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করা কোনপ্রকারে সম্ভব হয় নাই। কোন কোন মনস্তাত্ত্বিকগণের মতে যুদ্ধ-বৃত্তি হইতেছে মানবের অন্যতম সহজাত বৃত্তি। অতএব তাঁহারা ইহার রূপপরিবর্তনই যুদ্ধ দমনের একমাত্র উপায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

এই মতটির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গত ৫০০ বৎসর হইতে রাজনীতিমহলে শক্তিসাম্য (Balance of power) নীতির সাহায্যে যুদ্ধনিবারণের প্রচেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। কোন দেশ অথবা শক্তিগোষ্ঠী অতিরিক্ত শক্তিশালী হইয়া যাহাতে পরস্পর যুদ্ধ বাধাইতে না পারে—ইহাই ছিল শক্তিসাম্যনীতির ভিত্তি। কিন্তু এই নীতি অনুসরণের ফলে যুদ্ধনিবারণ হয় নাই, বরং অধিকাংশক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে আপন আপন দল বৃদ্ধি এবং আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। রাষ্ট্রসংঘ-গঠন বর্তমান শতাব্দীতে যুদ্ধনিবারণ-প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। একদিন হয়তো এই রাষ্ট্রসংঘের ভিতর দিয়াই সমগ্র পৃথিবী একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া একরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টা আশানুরূপ সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ইহা প্রথম স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রসংঘের সভ্যরা আশানুরূপভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন নন। রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিয়াও তাঁহারা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবেই কাজ করেন, সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। ফলে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে থাকিয়াও বিভিন্ন দেশের মধ্যে কলহ, বিবাদ ও প্রতিযোগিতা

চলিতে থাকিল। ইহাতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হইল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইহার সমাধি রচনা করিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আবার শান্তি-প্রচেষ্টা স্থরু হইল। পুনরায় রাষ্ট্রসংঘ (United Nations Organisation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বিশ্বশান্তির জন্য সকল রাষ্ট্রই ইহার দিকে চাহিয়া আছে। এইবার রাষ্ট্রসংঘ পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, যুদ্ধের ইচ্ছা যখন মানুষের মনেই সৃষ্টি হইয়া থাকে তখন এই ইচ্ছা ওখানেই ধ্বংশ করিতে হইবে। শিক্ষা দ্বারাই ইহা সম্ভব। স্থতরাং যুদ্ধ-নিবারণের দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অনেকখানি শিক্ষার উপরই বর্তাইয়াছে। আশানুরূপ জীবন-দর্শন, চারিত্রিক গুণাবলী এবং মানসিক ভাব (attitudes) গড়িয়া তুলিতে পারিলে হয়তো বা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমস্যার সমাধান হয়। বর্তমান যুগের গ্লানি ও অশান্তির জন্য মানব সভ্যতার সামঞ্জস্যহীন (unbalanced) অগ্রগতিই যে দায়ী তাহা অস্বীকার করা চলে না। বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রকৃতিকে মানুষ নিজের আয়ত্তে আনিয়াছে; তাহার ভোগের ক্ষমতা কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্ব বা মানবতার উন্নতি না হইয়া বরং অবনতিই ঘটিয়াছে। মানুষ নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তির পথ হারাইয়া নিজেরাই নিজেদের অশান্তি ও ধ্বংস ডাকিয়া আনিতেছে।

শিক্ষার উপর আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির দায়িত্ব

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এই প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ হইতে তাহাদের কি করিয়া বাঁচান সম্ভব? মানুষকে আত্মসমাহিত করিয়া তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ দ্বারা এই সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই ইহার একমাত্র পথ। আমাদের বিদ্যালয় হইতে এই শিক্ষা স্থরু হইবে। এইজন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে বিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে।

১। জীবনদর্শন সম্পর্কে উপলব্ধি:

ভোগেই মানুষের তৃপ্তি হয় না—ত্যাগেই তাহার শান্তি, তৃপ্তি ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে প্রত্যেকই প্রথম অগ্রসর হইবে—বিদ্যালয়-সমাজ পারস্পরিক ত্যাগ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কাজ

২। চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষসাধন :

উপরি-উক্ত জীবনদর্শন অনুযায়ী চারিত্রিক গুণাবলীও গঠন করিতে হইবে। এই গুণাবলীও মোটামুটিভাবে গণতান্ত্রিক নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেমন, প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা, পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সততা ও ন্যায়নীতিতে বিশ্বাস।

৩। মানসিক ভাব (attitude) :

অনেক সময়ে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির ফলে ঝগড়া, যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাহারও প্রতি যাহাতে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি না হয় এবং মন যুক্তিকে সর্বদা গ্রহণ করিয়া চলে তাহা দেখা উচিত। কোন দেশ বা জাতির সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই কাজগুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের অপর কাজের অঙ্গ হিসাবে চলিতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিদ্যালয় পরিচালনা ও ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শে ছাত্রদের বিশ্বাস আনিতে পারিলে বিশ্ব-সম্প্রীতির কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে। কিন্তু ইহা ব্যতীতও নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে :

১। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্য জাতি, দেশ বা অপরের ধর্ম সম্বন্ধে কোন অপপ্রচার না থাকে ইহা-লক্ষ্য করিতে হইবে। অপরের প্রতি অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করে এমন কোন সত্য ঘটনা পাঠ্যপুস্তকে থাকিলেও তাহার উপর তেমন জোর দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করিয়া ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। এইজন্য UNESCO বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক বিচার ও পর্যালোচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২। কোন জাতি, ধর্ম বা দেশের প্রতি যদি ছাত্রদের বিরূপ মনোভাব জন্মিয়া থাকে, তবে শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজনীয়।

৩। ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রৎ করিবার উদ্দেশ্যে U. N. O. এবং বিশেষভাবে UNESCO-এর প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথাসাধ্য সহযোগিতা ও সাহায্যদান প্রয়োজনীয় হইবে। ইহাদের বিভিন্ন কার্যাবলী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা প্রয়োজনীয়। ইহারা যে বিশেষ বিশেষ দিবস পালন করে, তাহাও প্রদর্শনী, বিতর্ক সভা, আলোচনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রতিপালন করা উচিত।

৪। বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্ব-যুবসংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজনীয়। ইহার ফলে তাহাদের মনে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভাব গড়িয়া উঠিবে।

৫। যখনই বিভিন্ন ধর্ম, জাতি বা দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ আসিবে, তখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়। যেমন, বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পরস্পরের সহযোগিতা, হিন্দুদের বিজয়া-সম্মেলনে, মুসলমানদের ঈদ-মুবারকে ও খৃষ্টানদের বড়দিনে এবং এইরূপ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মানুষ্ঠানে মিলিতভাবে আমোদ-প্রমোদ করিলে ও বিভিন্ন ধর্মের মূল কথাটি লইয়া আলোচনার মধ্য দিয়াই মানুষের মন হইতে ধর্মের গোড়ামি নষ্ট হইয়া যায়।

৬। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুযোগ আছে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী-দের মধ্যে মেলামেশার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দেশগুলি লইয়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান গঠন করা ভাল।

৭। বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্বন্ধে যত বেশী সম্ভব খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শনী ও ছায়াচিত্রের সাহায্যে ইহা করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংঘের মধ্যে পারম্পরিক পত্রের আদান-প্রদানের দ্বারাও এই সম্প্রীতি গভীর হইতে পারে।

৮। শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন হইতে হইবে। তাহা না হইলে বিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। এইজন্য শিক্ষকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক-ভাবে শিক্ষক বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা ভাল।

এইরূপে যদি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে মানুষের শ্রেষ্ঠ শত্রু ও লজ্জাকর গ্লানির মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব। একদিন বিশ্বরাষ্ট্র গড়িয়া ওঠাও অসম্ভব নহে।